শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য

॥ ১৮১৮—১৯১৮ ॥

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৯ ॥

॥ প্রথম প্রকাশ ॥

॥ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ ॥

*
**
*

মূল্য : সাত টাকা

শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশিত ও শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস (১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯) হইতে মুদ্রিত ॥

উৎসর্গ

বাংলার শিশু-সাহিত্যে পূর্বসূরিগণ স্মরণে—

ভূমিকা

এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক অবধি, বাংলার বালক-বালিকাদের উদ্দেশ্যে রচিত একশ' এক বৎসরকালের সাহিত্য—শিশুপাঠ্য সাহিত্য। এই কালটি বাংলায় ইংরেজ আমলের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় এবং ক্রমে তার প্রসার ঘটে। শিশুশিক্ষা ও শিশু-সাহিত্যে নিবিড় সম্পর্ক। ফলে, দ্বিতীয় দশকেই বাংলার শিশু-সাহিত্যেরও গোড়া পত্তন হয়। স্বভাবতই তার ভাব ও আদর্শ ছিল ইংরেজী। পরবর্তীকালেও এই প্রভাব থেকে তা মুক্ত হতে পারে না। আলোচ্য শতাব্দীকাল ধরে বাংলার শিশু-সাহিত্য কি ভাবে গঠিত, সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত হয়েছে, এই মহৎ কর্মে বাঙালী ও ইংরেজ মনীষিগণের কিরূপ নিষ্ঠা ও প্রযত্ন ছিল, এই গ্রন্থে সে বিষয়ই আলোচনা করে ধারাবাহিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের সময়ে সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের প্রধান বাহন পত্রিকা ও গ্রন্থ। বিগত সময়েও অন্যরূপ ছিল না। আধুনিক বাঙলা শিশু-সাহিত্যের ভিত্তি এই শতাব্দীকালের সাহিত্য। আমাদের এ কথার পক্ষে যুক্তিও এই গ্রন্থে আছে। বস্তু ও চিন্তাজগতে কোনও কিছুর উদ্ভব ঘটে সামান্য অবস্থা থেকে। সেকালের ও একালের বাঙলা শিশু-সাহিত্য পর্যালোচনা করে বিশ্বাস করা কঠিন যে, আধুনিক কালের শ্রী ও সমৃদ্ধির প্রারম্ভে ছিল এমন তুচ্ছতা, এমন শ্রীহীনতা। কিন্তু বিবর্তনের রীতিই এই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই এই সাহিত্যের পূর্ণ রূপ ও ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়। কোনও দেশের সাহিত্য যেমন সে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচায়ক, শিশু-সাহিত্যও তদ্রূপ। বস্তুত শিশু-সাহিত্য মনোজগতের কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফল নয়, সে দেশেরই জাতীয় সাহিত্যের একটি অংশমাত্র।

বাংলার প্রাচীন রূপকথা ও ছড়াগুলিকে শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সমগ্র রূপকথা ও ছড়াকে শিশু-সাহিত্য বলা চলে না। প্রাচীন

রূপকথা ও ছড়া বাংলার অগাধ লোকসাহিত্যেরই অন্তর্গত। এই সাহিত্যের রচনা ও প্রচার হয় মুখে মুখে এবং রচয়িতাও অজ্ঞাত। এই রত্নসম্ভার থেকে শিশুচিত্তের উপযোগী কতকগুলি ছড়া ও রূপকথা সংকলন করে কোনও কোনও শিশু-সাহিত্য রচয়িতা এই সময়ের মধ্যে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, গ্রন্থ-প্রসঙ্গে তারও আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক, এই দুই সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। প্রাচীন সাহিত্য একান্তই স্বদেশী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য অনুবাদপ্রধান। কেবল ইংরেজী নয়, সংস্কৃত, উর্দু, হিন্দী, ফরাসী ও ফারসি থেকেও বহু রচনা বাঙলায় তর্জমা করা হয়। মৌলিক রচনাবলীরও অনেকের বিষয়বস্তু ইংরেজী থেকে সংগৃহীত, ভাবও ইংরেজী, ভাষাও ইংরেজী ঘেঁষা। শেষোক্ত রচনাগুলি প্রধানত সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে প্রকাশিত শিশু-সাহিত্যে ছিল পাঠ্যপুস্তকের নীরসতা ও গুরুতা। সাহিত্যিক রসসৃজনের পরিবর্তে সেগুলিতে শিক্ষাদানের আগ্রহ প্রকট। এই অবস্থার মধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায় শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ-রস পরিবেশনের কিছু ব্যবস্থা করেন। কেবল গদ্যেরই এমন অবস্থা ছিল না, কবিতাকাননও ছিল শ্রীহীন ও শূন্য। যে অল্প সংখ্যক কবিতাপুষ্প পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়, সেগুলির অধিকাংশই ছিল নীতি-গন্ধী। এই সকল কারণে বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশকাল শিশু-সাহিত্যের লক্ষ্য ছিল—নীতি ও শিক্ষাপ্রচার।

অবশেষে ১৮৯২ খৃস্টাব্দে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিরোধানের পর বাংলার শিশু-সাহিত্যে নবযুগোদয় হয়। পত্রিকা-গ্রন্থে তার তরুণালোক প্রতিভাত হতে থাকে। এই কর্মে যিনি পথিকৃৎ তিনি পাঠ্যপুস্তকের নিগড়ের বাইরে শিশু-সাহিত্যের ধারা বইয়ে দিলেও, সাময়িক পত্রিকাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। যে গ্রন্থ-সাহায্যে মহৎ কর্মটি সাধিত হয়, সে গ্রন্থ ছিল নানাজনের বিবিধবিষয়ক রচনাসমৃদ্ধ। 'হাসি ও খেলা' নামক এই গ্রন্থখানি অদ্যাপি শিশুমহলে সাহিত্যরস পরিবেশন ও আনন্দ দান করে। অতঃপর এর আদর্শ গ্রহণ না করলেও নানাজনের গল্প, উপন্যাস, কাহিনী, কবিতা, ছড়া ও নাটকাদি প্রকাশিত হয়ে শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে থাকে। এগুলির কতক শাশ্বতসৃষ্টি। আলোচ্য শতাব্দীকাল মধ্যে বালক-বালিকাপাঠ্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী ও আমাদের জ্ঞাত সকল সাময়িক পত্রিকা এই গ্রন্থের আলোচনার বিষয়ভুক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু শিশু-সাহিত্যের সংজ্ঞায় কিছুটা অস্পষ্টতা থাকায় অশেষ বিতর্ক সৃষ্টি ও সময়ে সময়ে অশোভন মন্তব্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যকেই শিশু-সাহিত্য বলার পক্ষে। আবার, এদের মধ্যে বয়স বিভাগ করে এই সাহিত্যেও কেউ কেউ শ্রেণী-বিভাগের পক্ষপাতী। এ ক্ষেত্রে আমাদের কথা এই যে, যে শিশুর অক্ষরপরিচয় ঘটেছে এবং নিজেই সহজগ্রন্থ পাঠে সক্ষম, আর যে শিশু অক্ষরপরিচয়ের নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছয় নি, যার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঘটে, এই দুই প্রকার শিশুর সাহিত্যকে বিভক্ত করলে ভুল হয় এমন কথা বলা যায় না। কারণ, উভয়ের বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তিতে তারতম্য থাকারই কথা। অপর দিকে, আট নয় বৎসর ও চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তিতে পার্থক্যও অনেক। সেজন্য এদের উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যকে সমপর্যায়ভুক্ত করার মধ্যেও সঙ্গতি থাকে না। এ কারণ, চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য সাহিত্যকে কেউ কেউ কিশোরসাহিত্য বলেন। বস্তুত এই বয়সের পাঠক-পাঠিকা ন্যূনবয়স্ক বালক-বালিকাগণের মতো রূপকথা, ছড়া ও জীবজগতের গল্পে তৃপ্ত হয় না। অথচ পরিণতমন পাঠকগণোদ্দেশ্যে রচিত উপন্যাস, গল্প-কবিতাদির যথোচিত রসগ্রহণেও এরা অক্ষম। এই সকল কারণে বালক-বালিকাগণের জন্য রচিত তাবৎ সাহিত্যেই আমরা শ্রেণী-বিভাগের পক্ষে নই।

প্রাচীন বাংলার রূপকথা ও ছড়ার উদ্ভব-প্রসার লোকমুখে। সেকালে এই সাহিত্যের শ্রোতা ছিল, পাঠক ছিল না। কিন্তু ইংরেজ আমলে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শিশু-সাহিত্য লিখিত, গ্রন্থে পত্রিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে আসছে। ফলে পাঠকমহল সৃষ্ট হয়েছে। এই গ্রন্থে বিগত শতাব্দীকালে বাংলার লিখিত শিশু-সাহিত্যেরই উদ্ভব ও বিবর্তনধারা প্রদর্শনের চেষ্টা করেছি। এই সময়ের পরবর্তীকালের সাহিত্য আমাদের আলোচ্য নয়। তা ভবিষ্যৎ কর্মীর অপেক্ষায় আছে।

প্রসঙ্গত এখানে 'শিশু-সাহিত্যিক' শব্দটির উল্লেখ না করে থাকা যায় না। শব্দটির ব্যাকরণসম্মত অর্থ কি? যিনি শিশুগণের জন্য সাহিত্য রচনা করেন তাঁকেই বলা যায় কি? তাহলে যিনি সাবালকগণের জন্য সাহিত্য রচনা করে থাকেন তাঁকে কি, বলবো? শিশু-সাহিত্যিক শব্দটির

ব্যবহারেও সাহিত্যিকের প্রতি যথোচিত মর্যাদার অভাব ও ব্যঙ্গ প্রকাশ পায়, যদিও বহু মহাজন অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এই সাহিত্য রচনা করে গেছেন। আর, যাঁরা কেবল এই সাহিত্য-রচনায় জীবনপাত করে গেলেন, তাঁদের মধ্যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ও যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষও ছিলেন, যে গুণ অধিকাংশেই নেই। সৌভাগ্যবশত অধুনা লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের জাতীয় সরকারও এই সাহিত্যকে স্বীকৃতি দিয়ে সাহিত্যিককে পুরস্কৃত করতে সচেষ্ট। কিন্তু পুরস্কারদানের ফলে শিশু-সাহিত্য রচয়িতামহলে যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার ঘটেছে অবস্থা দৃষ্টে তা বলা যায় না। কারণটি অনুসন্ধানযোগ্য। তবে কথা এই, সাহিত্য-সৃষ্টি প্রতিভার ওপর নির্ভরশীল।

আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্যকালের শিশু-সাহিত্যকে আমরা 'পত্রিকা-প্রসঙ্গ' ও 'গ্রন্থ-প্রসঙ্গ' এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছি। গ্রন্থের অতি অল্পকাল পূর্বেই পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায়, প্রথমে পত্রিকার আলোচনা করা হয়েছে। পত্রিকা-প্রসঙ্গও আবার শতকানুসারে ঊনবিংশ ও বিংশ, এই দুই ভাগে বিভক্ত। গ্রন্থ-প্রসঙ্গকেও ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্যানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অনাবশ্যকবোধে পাদটীকা ও উদ্ধৃতি শেষে পত্রাঙ্কাদি দিয়ে সহজ বিষয়কে জটিল করা সমীচীন মনে করি নি।

বাংলার আধুনিক শিশু-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস এই প্রথম রচিত ও প্রকাশিত হোল। সেজন্য গ্রন্থখানিকে ত্রুটিশূন্য করতে পারা যায় নি। পথিকৃতের কর্ম দুরূহ। কর্মপথে আমাকে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে। 'শিশু-সাহিত্য আবার কি? এর ইতিহাসই বা কি থাকতে পারে?' এই তাচ্ছিল্য মনোভাবের ফলে বিগত শতাব্দীর ও বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেরও বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহুগ্রন্থের নাম কেবল বৃটিশ মিউজিয়ামের ও ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকায় পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রন্থগুলির অধিকাংশই নাগালের বাইরে। আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটিকে সাধুবাদ জানাই যে, তাঁরা অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে বাংলার বালক-বালিকাপাঠ্য বহু পত্রিকা ও গ্রন্থ তাঁদের গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষা করছেন। তাঁদের সহযোগিতার অভাব ঘটলে বর্তমান গ্রন্থখানি রচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হোত। আশঙ্কা ছিল, বাঙলা সাহিত্যের এই উপেক্ষিত অংশের ইতিহাস যদি বা কোনক্রমে রচনায় সমর্থ হই, প্রকাশকের অভাবে

পাণ্ডুলিপিখানি আমার ঘরেই দিনে দিনে জীর্ণ হবে। কিন্তু বিদ্যোদয় লাইব্রেরির সুধী ও সহৃদয় কর্তৃপক্ষ আমার আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করলেন।

পাণ্ডুলিপি রচনাকালে বহু সজ্জনের উৎসাহবাক্যে শক্তি লাভ করেছি। এখানে তাঁদের সকলের নাম প্রকাশের স্থান থাকলে সুখ বোধ করতাম। তার অভাবে তাঁদের উদ্দেশ্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা ছাড়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্য উপায় আমার নেই। কিন্তু যে দুজনের ঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধ্য তাঁদের নামোল্লেখ না করলে ঋণের সঙ্গে অন্যায় যুক্ত হবে। তাঁদের একজন হলেন, আমার দীর্ঘকালের সুহৃৎ ইতিহাস-বেত্তা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, অন্যজন সাংবাদিক-সাহিত্যিক স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত অরুণ রায়। শ্রীযুক্ত বাগল গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পাঠ করে তাঁর ১৯৫৮ খৃস্টাব্দের 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা'য় ইংরেজ আমলের বাংলার মৌলিক ছোটগল্পে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম অক্ষয়কীর্তি বিষয়ে আমার বক্তব্য বিদ্বজ্জন সভায় উপস্থাপিত করে আমাকে বহু মান দিয়েছেন। এই গ্রন্থের নামকরণের জন্যও তিনি দায়ী। আরও নানাভাবে তিনি আমার সহায় ছিলেন। আর, শ্রীযুক্ত রায় 'পত্রিকা-প্রসঙ্গে'র ঊনবিংশ শতকের অধিকাংশ ও 'গ্রন্থ-প্রসঙ্গের' কিয়দংশ "স্বাধীনতা"র 'রবিবারের পাতায়' সাগ্রহে প্রকাশের ব্যবস্থা করে গ্রন্থখানির বিষয় দু'বৎসর পূর্বেই পাঠক-সাধারণে প্রচার করেন।

এখন সুধীজনের কাছে গ্রন্থখানি আদৃত হোলে আমার শ্রম সার্থক হবে এবং নিজকে কৃতার্থ মনে করবো।

কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

॥ সূচীপত্র ॥

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য

॥ ১৮১৮—১৯১৮ ॥

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

॥ পত্রিকা-প্রসঙ্গ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দী

॥ ১৮১৮ খৃঃ অঃ—১৯০০ খৃঃ অঃ ॥

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে আজ অবধি আমাদের বাংলা দেশে শিশুপাঠ্য (বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী পাঠ্য) নানা ধরনের বাংলা সাময়িক পত্রের প্রকাশ ঘটেছে। সংখ্যায় সেগুলি পঞ্চাশের নিচে হবে না। এই সকল পত্রিকার অধিকাংশেরই জন্ম খাস কলকাতা শহর। তবে কোনও কোনটির জন্ম শহরতলী বা কোনও মফঃস্বল শহরে। প্রাপ্তবয়স্কগণের পত্রিকাব মতোই শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকাও মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও দৈনিকরূপে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে মাসিকের সংখ্যাই অধিক। সাপ্তাহিকের সংখ্যা অনেক কম; পাক্ষিকের সংখ্যা আরও কম এবং দৈনিক মাত্র একখানি। কিন্তু আমরা যতটা জানি, তাদের প্রায় সকলেরই মৃত্যু ঘটেছে অতি শৈশবে। যে কয়খানি আজও জীবিত সে কয়খানির মধ্যে 'মৌচাক'কেই প্রৌঢ়া বলা যায় যদি আটত্রিশ বৎসর বয়সটাকে প্রৌঢ়ত্বের সীমাভুক্ত করতে কারও আপত্তি না থাকে। এই হিসাবে উক্ত পত্রিকাখানি আর সকল জীবিত শিশুপাঠ্য পত্রিকার অগ্রজা।

এই সকল পত্রিকা কেবল বয়স্কগণের প্রচেষ্টা ও উদ্যমে প্রকাশিত হয় নি, কোনও কোনও পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছে শিশুদেরই উদ্যম ও প্রচেষ্টায়। এটা কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীর বাঙলা শিশুপাঠ্য পত্রিকা-জগতের ঘটনা নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীরও শেষার্ধের প্রথম দিকে ছুটি

কিশোরের প্রচেষ্টায় ও উদ্যমে একখানি শিশুপাঠ্য বাঙলা মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাখানি সম্পাদনও করতেন তাঁরা দুজনে। পত্রিকাখানির নাম ছিল 'বিদ্যাদর্পণ'।

১॥ এই বিদ্যাদর্পণের পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৮১৮ খৃস্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন কর্তৃক 'দিগ্দর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মারশ্ম্যান। পত্রিকাটির নামপৃষ্ঠায় 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' লিখিত থাকায় কেবল যুবকগণের জন্যই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হোত, এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মাত্র যুবকগণকে উপদেশদানে শিক্ষিত করার কি কারণ থাকতে পারে? সাধারণত শিশু ও কিশোরবয়স্কগণের শিক্ষার জন্য পত্রিকাস্থ বিষয়গুলির উপদেশদানের প্রয়োজন হয়। পরবর্তী সময়ে বালক-বালিকাপাঠ্য পত্রিকাগুলিতে এবম্বিধ বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়। সেজন্য 'দিগ্দর্শন'কে আমরা কিশোরপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা পর্যায়ভুক্ত করার পক্ষে। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটিও ছাত্রগণের শিক্ষার উপযোগী বিবেচনা করে এর বহুখণ্ড ক্রয় ও ছাত্রগণের মধ্যে বিতরণ করেন। এইখানিই বাংলার প্রথম কিশোরপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা বলে আমরা মনে করি।

পত্রিকাখানি সম্ভবত সচিত্র ছিল না। মুদ্রিত পাঠের মধ্যে বা পৃথকভাবে সংলগ্ন কোনও চিত্রের সন্ধান আমরা এতে পাই নি। এতে ভূগোল-বৃত্তান্ত, কৃষিকথা, প্রাণিতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, ভৌগোলিক আবিষ্কার-কাহিনী (কলম্বাসের) ও ইতিহাস লিখিত আছে। ভারত ও বঙ্গদেশের কথাও আছে।

তখন বাঙলা গদ্যেরও শৈশব। তবুও এই পত্রিকা বেশ সহজ ভাষায় লেখা হয়। পত্রিকাস্থ রচনার একটু নমুনা পাঠে তা বোঝা যায়। চুম্বকপাথর সম্বন্ধে বর্ণনা :

> অনুমান হয় পাঁচশত বৎসর গত হইল চুম্বকপাথরের গুণ প্রথম জানা গেল তাহার গুণ এই যে তাহাকে ঘষিলে সে লৌহের ঘৃষ্ট দিগ্ সর্ব্বদা উত্তর কেন্দ্রে অর্থাৎ উত্তর ভাগে থাকে।

দিগ্দর্শন।—

প্রথম ভাগ।—

আমিরিকার দর্শন বিষয়।—

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক্ এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপহইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল আট শত আটানব্বই শালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্ব্বে আমেরিকা কোন লোককর্ত্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।—

যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যেং কর্ম্ম হইয়াছে সেং কর্ম্মহইতে এ কর্ম্ম বড়। অনুমান পাঁচ শত বৎসর গত হইল চুম্বক পাথরের গুণ প্রথম জানা গেল তাহার গুণ এই যে তাহাকে কোন লৌহে ঘষিলে সে লৌহ সর্ব্বদা দুই কেন্দ্রে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে থাকে সেই লৌহ কোম্পাসের মধ্যে দিলে সমুদ্রে কিম্বা মৃত্তিকার উপরে যে কোন স্থানে কোন লোক থাকে সেই কোম্পাসের দ্বারা পৃথিবীর সকল ভাগ সে জানিতে পারে। কোম্পাসের গঠন এই মত এক কাগজের উপরে মণ্ডলাকৃতি করিয়া বত্রিশ সমাংশ করিয়া চতুর্দ্দিকে সকল দিগ ও বিদিগ্ ও উপদিগ্

ক   না

চীন দেশের মহাপ্রাচীর সম্বন্ধে লেখা আছে 'চীন দেশের মহা-প্রাচীর বিষয়ে'

এই প্রাচীর চীন দেশের সকল হইতে আশ্চর্য্য এবং প্রায় পৃথিবীর মধ্যেই আশ্চর্য্য, ঐ প্রাচীর দ্বারা তাতার দেশ হইতে সে দিকে চীন দেশের রক্ষা হয়।

পত্রিকাখানির দশম ভাগ থেকে 'হিন্দুস্থানের ইতিহাস' আরম্ভ। তার প্রারম্ভে লেখা আছে :

গজনেনের বাদশাহ মহমুদ কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান জয় করা অবধি মুসলমানদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া ইংলণ্ডীয়দের রাজ্য-স্থাপন পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের ইতিহাস।

পুস্তকের শেষে শব্দার্থ— অভিধান— দেওয়া থাকতো।

এই পত্রিকায় সুকুমারমতি ছাত্রগণকে বিজ্ঞান ও ইতিহাস শিক্ষা-দানের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এর ভাষা লক্ষ্য করবার মতো। অনেক বাক্যশেষে পূর্ণ যতিচিহ্ন নেই।

২॥ এই পত্রিকার চার বৎসর পরে ১৮২২ খৃস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে স্বয়ং কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি 'পশ্বাবলী' নামে একখানি শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। সোসাইটি ১৮১৭ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রচেষ্টায় বাংলা দেশে যে শিক্ষার বিস্তার ঘটে একথা আজ আর প্রমাণের প্রয়োজন নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শিশু-সাহিত্য এঁদেরই প্রচেষ্টায় অনেকখানি সমৃদ্ধি লাভ করে। এ সম্বন্ধে অন্যত্র গ্রন্থ-প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

'পশ্বাবলী'কে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ের পত্রের কাহিনী ইংরেজীতে সংগ্রহ করেন পাদ্রি লসন্। সেগুলিকে বাঙলায় অনুবাদ করেন ডবলু. এইচ. পীয়ারস্। লসনের মৃত্যুর পর হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র 'পশ্বাবলী' পরিচালন করেছিলেন। তৎপরিচালিত পশ্বাবলীকেই আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত করেছি। দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হয় সম্ভবত ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে।

পশ্বাবলীর প্রতি সংখ্যায় থাকতো একটি করে জন্তুর বিবরণ (বৃত্তান্ত), আর প্রথম পৃষ্ঠায় থাকতো সেই জন্তুর একটি ছবি। কাঠ-খোদাই করে তার সাহায্যে সে ছবি ছাপা হোত। এইভাবে প্রথম থেকে ষষ্ঠ সংখ্যা অবধি যথাক্রমে সিংহ, ভালুক, হস্তী, গণ্ডার ও হিপোপটেমাস, ব্যাঘ্র ও বিড়ালের বিবরণ এবং ছবি ছাপা হয়। সোসাইটি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পারিতোষিকদানের উদ্দেশ্যে সংখ্যাগুলি একত্রে প্রকাশ করে তারই নাম দিয়েছিলেন 'পশ্বাবলী'।

পশ্বাবলীর প্রথম খণ্ডের রচনারীতি ছিল নিম্নরূপ :

পশ্বাবলী

প্রথম খণ্ড।

সিংহের বিবরণ।

সিংহের বৃত্তান্ত কথা শুন দিয়া মন,
যাহার প্রতিমা এই উপরে লিখন।
সকল পশুর মধ্যে হয় বলশালী,
সেই হেতু ইহাকে পশুর রাজা বলি।

প্রথমাধ্যায়।—সিংহের আকারাদি।

ইহার জন্মস্থান আফ্রিকা ও আসিয়া, এই উভয় দেশের মধ্যস্থানেই জন্মে, এই কারণ শীতস্থানে কখন বাস করে না। যে ২ নিভৃতস্থানে উষ্ণের নিমিত্তে লোকেরা বাস করিতে পারে না, সেইখানে সিংহ অনায়াসে ও সুখে বাস করে। উষ্ণ দেশোৎপন্ন প্রযুক্ত তাহারা স্বাভাবিক রাগী ও বলবান হয়। পূর্ব্বে ঐ দেশদ্বয়ের মধ্যারণ্যে অনেক অনেক সিংহ উৎপন্ন হইত, কিন্তু এইক্ষণে তাহার অনেক ন্যূনতা দেখা যায়। ···

'পশ্বাবলী'র তৃতীয় আধ্যায়ে একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে। সেটি নিম্নে উদ্ধৃত হোল :

শৃগালের ক্রোড়পত্র

জেলা নদিয়ার মাটিয়ারি পরগণার সাহারাদপুর গ্রামে শ্রীপলিন বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি মুছলমান ছিল ; সে প্রতিদিন

রোজা করিত; তাহাতে ঐ গ্রামের উত্তর দিকে গিয়া পাক করিয়া সন্ধ্যাকালে আহার করিত, শৃগালের দিগকেও অন্ন দিত; ঐ অন্নাশাতে অনেক শৃগাল সেই স্থানে একত্র হইয়াছিল, কিন্তু যখন বিশ্বাস পাক আরম্ভ করিত, তখন সকল শৃগাল নির্ভয়ে অশব্দে বসিয়া থাকিত; পাক সমাপ্ত হইলে সকলকে ডাকিয়া নিরূপিত খাপরায় তাহার দিগকে অন্ন দিত, তাহাতে শৃগালেরা আপন ২ ভাগ খাইয়া অন্য কোন ভাগের উপর আক্রমণ করিত না, আর শৃগালেরা ঐ বিশ্বাসের নিকটে অতি নির্ভয়ে আপন ২ বাচ্চার সহিত গতায়াত করিত এবং তাহার দিগকে ভাগ ২ করিয়া দিলে যাবৎ বিশ্বাসের আজ্ঞা না পায় তাবৎ ঐ অন্নের নিকটে বসিয়া থাকে; আজ্ঞা পাইলে স্ব ২ ভাগ মাত্র খায়।

এক দিবস ঐ বিশ্বাসের ২ বৎসর বয়স্কা এক পৌত্রীর মৃত্যু হইলে, বিশ্বাস শোকার্ত্ত হইয়া অনেক রোদন করিয়া সে দিবস আহার না করিয়া কোন লোকদ্বারা অন্ন প্রস্তুত করাইয়া শৃগালের দিগকে নিয়মানুসারে দিল; তাহাতে প্রচুর দুঃখে কোন শৃগাল সেদিন অন্ন খাইল না।

এবং সেই কন্যার গোর সেই স্থানে দিলে শৃগালেরা অতিশয় মাংসাশী হইয়াও অন্য ২ বালকের গোরের মত তাহার কোন ব্যাঘাত করিল না, বরং ঐ গোরের রক্ষা করিল, ইহাতে হে মনুষ্যেরা, শৃগালের প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানিয়া তোমার দিগেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

স্কুল-বুক সোসাইটির রীতি ছিল, প্রথমে বিষয়টি ইংরেজীতে রচনা করা। তারপর বাঙলায় সেটির তর্জমা করা। সেজন্য গ্রন্থের এক-পৃষ্ঠায় ইংরেজী, বিপরীত পৃষ্ঠায় তার বাঙলা তর্জমা দেওয়া হোত। কিন্তু আমরা যে গ্রন্থখানি পাঠের সুযোগ লাভ করেছি তাতে এই রীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। তবুও রচনাটিকে মৌলিক বলা যেতে পারে না। কারণ, সোসাইটি তাঁদের প্রতিষ্ঠাকালের অন্তত বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে যে এই রীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তার প্রমাণ নেই।

সোসাইটির কাজকর্মের সংবাদ থাকতো তাঁদের রিপোর্টে। সোসাইটি সম্বন্ধে সেইটেই প্রধান প্রমাণ। আমাদের বিশেষ অসুবিধা এই যে, আমরা মাত্র ১৮১৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৪৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রিপোর্টই *দেখবার সুযোগ লাভ করেছি, তার পরের রিপোর্ট দেখতে পাই নি,* যদিও সোসাইটি তারপরও জীবিত ছিল আরও দশ-পনেরো বৎসর।

'পশ্বাবলী' যে মাসিক পত্রিকা—শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা ছিল, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা নেই। তার ওপর 'ক্রোড়পত্র' কেবল পত্রিকারই থাকে, গ্রন্থের থাকে না।

দ্বিতীয় পর্যায়ের 'পশ্বাবলী'র প্রথম সংখ্যায় ছিল 'কুকুরের বৃত্তান্ত'। রামচন্দ্র মিত্র 'পশ্বাবলী'র ষোলখানি সংখ্যা প্রকাশ করেন, কেবল বাঙলায় নয়, ইংরেজী ভাষাতেও। 'পশ্বাবলী'কেই বাঙলার দ্বিতীয় শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্র বলা যেতে পারে। তবে তার বিষয় ছিল মাত্র একটি এবং বর্তমানের বা তার বৎসর কতক পরের সাময়িক পত্রের রূপও তাতে ছিল না। প্রাণী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিতরণ ছিল তার উদ্দেশ্য।

৩॥ অতঃপর ১৮৩১ খৃস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর কৃষ্ণধন মিত্র 'জ্ঞানোদয়' নামে একখানি শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। তাতে নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোলের কাহিনী প্রকাশিত হোত। তবে পত্রিকাখানি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নি। মোট বিশখানি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়।

পত্রিকাখানিতে ভারতের—প্রাচীনকালের এবং মুসলমান বিজয় থেকে মুসলমান আমলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ষষ্ঠ সংখ্যার দ্বিতীয় পাঠে আছে 'চীন্‌দেশের বিবরণ'। আরম্ভ— 'সর্ব্বদেশাপেক্ষায় চীন্‌দেশে প্রথমে ধারাস্বরূপ রাজশাসন ছিল।' আবার গ্রীসদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, রোমেরও আছে।

'জ্ঞানোদয়ে'র বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে :

> এই পুস্তক প্রতিমাসে মুদ্রাঙ্কিত হইবে ইহা গ্রহণে যে যে মহাশয়ের বাঞ্ছা হয় তাঁহারা স্বীয় অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক সিমলার

নীলমণি মিত্রের স্ট্রীটের ২০ সংখ্যার বাটিতে এক পত্র প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য ।।০ মুদ্রামাত্র এবং এই পুস্তক গ্রহণে যে যে মহাশয়েরা স্বীকার করিয়াছেন সেই ২ মহাশয়ের নিকটে যদ্যপি না পৌঁছে তবে স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিয়া এক পত্র পাঠাইলে আমরা অবিলম্বে পাঠাইয়া দিব। ইতি।

'পশ্বাবলী'র রচনাটির বাক্য ও বাক্যাংশ যতিচিহ্ন দ্বারা সংযত ও খণ্ডিত। একালের পাঠকপাঠিকাগণ তা স্বচ্ছন্দে পাঠ করতে পারেন। এমন হবার কারণ মূল ইংরেজীকে অনুসরণ। তাই বাক্যে কমা, সেমিকোলন ও ফুলস্টপ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু 'জ্ঞানোদয়ে'র বিজ্ঞাপনটি মৌলিক রচনা। সেজন্য কেবল শেষ বাক্যটির অন্তে সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী 'ছেদ বা দাঁড়ি' ও 'ইতি' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পুস্তকশেষে লিখিত আছে :

এই পুস্তক জ্ঞানোদয় প্রেসে মুদ্রিত হইল। ইং জানেওয়ারি ১৮৩৩ সাল।

মনে হয় ঐ বৎসর ও মাসই পত্রিকাখানির প্রতিষ্ঠাকাল। কিন্তু আমরা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র তালিকায় দেখি পত্রিকাখানি তারও দু' বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তবে আমরা পত্রিকাখানির প্রচ্ছদপট ও নামপৃষ্ঠা দেখবার সুযোগ লাভ করি নি; শেষের কথাগুলি ভিত্তি করেই মত প্রকাশ করছি।

পত্রিকাখানির প্রথম পৃষ্ঠায় যা মুদ্রিত আছে তা এই :

জ্ঞানোদয়

১ সংখ্যা ।।

।। প্রথম পাঠ ।।

যৌবনাবস্থাতে সত্ বিদ্যোৎপার্জ্জন করা অত্যুচিত। পরোপকার করিবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করা মনুষ্যের অত্যাবশ্যক। যুবা ব্যক্তির প্রধান অলঙ্কার লজ্জা হইয়াছেন।

কোন বিষয় অঙ্গীকার করিবার পূর্ব্বক্ষণেই বিবেচনা করা অতি কর্তব্য।

নিরাকাঙ্ক্ষি মন হয়েন এক অমূল্য মহারত্ন।

অলস দুঃখের ও পাপের ও ঈকর্ম্মের মূলাধার।

যাঁহারা সর্ব্বদা অনৃত কহেন তাহার দিগের প্রতি কদাচ বিশ্বাস থাকে না।

জ্ঞানী ব্যক্তি পরদোষ দর্শন করিয়া আপন দোষকে শোধিত করেন।

বন্ধু ব্যতীত এ সংসার বন স্বরূপ।

পাপক্রিয়া বিলম্বে বা অবিলম্বে প্রকাশ পাইয়া মহৎ দুঃখোৎপাদিকা হয়েন।

সম্পত্তিকালীন বহুবিধ বন্ধুগণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু বিপত্য সময়েই বন্ধুতা ব্যক্তা হয়েন।

ধন সার মৃত্তিকার ন্যায়। তাহাকে যদবধি ব্যয়রূপ ভূমিতে বপন করা না যায় তদবধি ইহাতে বিশেষ শস্যোৎপত্তি হয় না।

আমরা সর্ব্ব সময়ে খেদ করি যে অস্মদাদির পরমায়ু অত্যল্প কিন্তু কার্য্যাবসে এবংপ্রকার প্রকাশ হইতেছে যে অমূল্য পরমায়ুর শেষ হয় না।

উপদেশগুলির লক্ষ্য 'যুবা ব্যক্তি'গণ। শিশু ও কিশোরবয়স্কগণ যে উপদেশবাক্যাবলীর অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করতে অপারগ তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তবুও এখানিই ছিল বাঙালী পরিচালিত প্রথম শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। এর রচনাবলী ছিল মৌলিক ও ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা। স্কুল-বুক সোসাইটি এই Native Magazine-এর সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক মিত্রমহাশয়কে উৎসাহ দানোদ্দেশ্যে ৫০ খানি ক্রয় করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থখানিকে স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ। (সোসাইটির দশম রিপোর্ট দ্রষ্টব্য। ১৮৩২-৩৩ খৃঃ অঃ)। দিগ্দর্শনও 'যুবলোকের দিগের' উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল এবং সোসাইটি কতকগুলি সংখ্যা

একত্রে বাঁধাই করে স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কার দেন। তবে বিবর্তনের স্বাভাবিক কারণেই 'জ্ঞানোদয়ে'র বিষয়বস্তুতে কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়।

পত্রিকাখানির তৃতীয় সংখ্যায় নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক কাহিনীটি আছে :

শক্রকে ক্ষমা করণ বিষয়

যখন চীন দেশীয় মহারাজ শুনিলেন যে শক্ররা তাঁহার কোন দূরবর্ত্তি প্রদেশে উপপ্লব করিতে উপস্থিত হইয়াছে তখন তিনি আপন সৈন্যগণকে কহিলেন যে তোমরা আমার পশ্চাতে আইস এবং আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তাহাদিগকে শীঘ্র বিনাশ করিব।

অনন্তর তথায় তাঁহার উপস্থিতি হওনেতে ঐ শক্ররা তাঁহার অধীন হইল। তৎকালে সৈন্যেরা দেখিল বাজা তাহারদিগের কাহাকেও দয়া ও কাহারও সহিত শিষ্টতা ব্যবহাব করিলেন তখন তাহারা অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিল। এবং তৎকালে প্রধান মন্ত্রী রাজাকে কহিল হে মহারাজ আপনি কি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কেননা মহারাজ এই কহিয়াছিলেন যে শক্রদিগকে বিনাশ করিব কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা না করিয়া কতক শক্রদিগকে ক্ষমা ও কাহাকেও আদর করিতেছেন। রাজা দয়াপ্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন যে শক্র বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম বটে সে সত্য কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছি কারণ দেখ এই ব্যক্তিরা শক্র নহে এইক্ষণে বন্ধু হইয়াছে।

৪ ॥ আবার 'পশ্বাবলী'র রামচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় স্কুল-বুক সোসাইটির সাহায্যে ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে 'পক্ষির বৃত্তান্ত Orinthology No 1' নামে একখানি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তার দাম ছিল দশ পয়সা। কিন্তু এই পত্রিকা দীর্ঘকাল চলে না। এই পত্রিকাও ছিল পশ্বাবলীর অন্তর্গত।

৫ ॥ তারপর ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে ২৬শে এপ্রিল প্রকাশিত হয় 'বিদ্যাদর্পণ' নামে মাসিক পত্রিকাখানি।

পরবর্তী ৩রা মে তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে লিখেছেন :

> শ্রীযুক্তবাবু প্রিয়মাধব বসু তথা যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক 'বিদ্যাদর্পণ' নামে এক মাসিক নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহা পাঠ করত বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, পুস্তকের পরিমাণ যোড়শ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই আনা মাত্র, প্রিয়মাধব-বাবু ও যোগেন্দ্রবাবুর বয়ক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক নহে, কিন্তু এই নবীন বয়সে তাঁহারা যেরূপ রচনা করিয়াছেন তৎপাঠে পাঠক মহাশয়েরা চমৎকৃত হইবেন।
>
> এই মাসিক পুস্তক প্রতিমাসের ১৫ তারিখে প্রকাশ। ইহাতে নীতি, ইতিহাস, কবিতা ও বালকদিগের পাঠযোগ্য অনেক বিষয় লিখিত থাকে।

৬ ॥ এই পত্রিকার পর ১৮৬০ খৃস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে খৃস্টান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি প্রকাশ করেন 'সত্যপ্রদীপ' নামে একখানি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাখানি প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়ে প্রায় পাঁচ বৎসর জীবিত থাকে। এতেই বোঝা যায়, 'সত্যপ্রদীপ' জনপ্রিয় ছিল।

৭ ॥ অতঃপর মাসিকপত্র অবোধ-বন্ধু—১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে (ইংরেজী ১৮৬৬ খৃঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। প্রথমে সম্পাদক ছিলেন, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। পর বৎসর কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হন। যোগেন্দ্রবাবু তাঁকে পত্রিকাখানি দান করেন। কিন্তু অবোধ-বন্ধুর প্রথম প্রকাশ ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে। তবে সে সময়ে বেশী দিন চলে না।

তখন বিদ্যাসাগর-যুগের প্রথম ভাগ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বাঙলা গদ্য অনেকটা পুষ্ট ও গঠিত। কিন্তু গদ্যলেখক বিষয়বস্তুর জন্য অনেকাংশে নির্ভর করেন ইংরেজীর ওপর। সেজন্য এই

পত্রিকাখানিরও অনেকগুলি রচনা ইংরেজীগ্রন্থ ও ইংরেজ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে রচিত। যা হোক, পত্রিকাখানির প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যার প্রথমেই আছে :

স্বদেশের যে প্রকাবে হোতে পারে হিত
সাধ্যমত চেষ্টা কবা সবার উচিত।
তিল সম হেন কাজ যদি মনে লয়,
তথাচ নিরস্ত থাকা, যুক্তিযুক্ত নয়,
কি জানি সহস্র মাঝে যদি কোন জন
সামান্য সে ক্ষুদ্র কাজে উপকৃত হন।

আরম্ভ।

সূর্য্য যেমন অস্তমিত হইলে আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ এই অবোধ-বন্ধু এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পাঠকবর্গের নিকট অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিতে ছিল। এক্ষণে তাহা পুনর্ব্বার সর্ব্বসমীপে উদয় হইতেছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা প্রখরতর কর বিস্তার করিয়া যাহাতে তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞানান্ধ মনকে সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোকদ্বারা উদ্দীপ্ত করে তাহাই আমাদের একান্ত বাসনা। শীতকালে যখন শীতের প্রাদুর্ভাব অধিক হয়, যখন শীতল বায়ু বহমান হইয়া সকলকেই কম্পিত করিতে থাকে, তখন যেমন ভানুর তীক্ষ্ণতর কিরণ প্রাণী দেহের শীত নিবারণ করে, সেইরূপ এই অবোধ-বন্ধু, যদ্যপি কোন একটি বালকবালিকা কিম্বা অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের অথবা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিব্যূহের অন্তরতম গভীরতম প্রদেশে স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করত দুশ্ছেদ্য ও অভেদ্য কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা বিদূরিত করে, তাহা হইলে আমাদেব পরিশ্রম ও যত্নের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে; এতদ্ভিন্ন এই ক্ষুদ্র অবোধ-বন্ধু যদি ক্ষণকালের নিমিত্ত বিজ্ঞসমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, আমরা আশাতীত ফললাভ করিব।

কিন্তু দেখা যায় কি গদ্য কি পদ্য কোনটিই ঠিক শিশুপাঠ্য হয়ে উঠতে পারে নি। কতকগুলির বিষয়বস্তু তো শিশু ও কিশোরোপযোগী

আদৌ নয়। যেমন, 'অপূর্ব্ব পতন', 'পতির অত্যাচার', 'সংসার', 'বিরহিনী', 'বঙ্গসুন্দরী' ইত্যাদি কাব্য ও কবিতানিচয়। বিহারীলালের 'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্যের অধিকাংশ অবোধ-বন্ধুতেই প্রকাশিত হয়। তাঁর 'সুরবালা' কাব্যেরও কিছু অংশ এতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার রচনাবলী যে 'অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের অথবা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিব্যূহের' বোধযোগ্য হয়েছিল আমাদের এমন মনে হয় না। অধিকাংশ গদ্য ও পদ্যরচনার মর্মোপলব্ধি সাধারণ মেধাবিনী অন্তঃপুরিকাগণের ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্নের সাধ্যাতীত বলেই আমাদের দৃঢ় ধারণা। তবুও পত্রিকাখানি তিন বৎসর চলে এবং স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কবি বিহারীলালকেই দ্বিতীয় ভাগের শেষ থেকে স্বত্বাধিকার দান করেছিলেন। কেন করেছিলেন তা তিনি প্রকাশ করেন নি। অনুমান, পত্রিকার আয়ের চেয়ে পরিচালন-ব্যয় অধিক হয়, এই কারণেই।

পত্রিকাখানিতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, চরিতকথা, গল্প, কবিতা ও গ্রন্থসমালোচনা প্রভৃতি প্রকাশিত হোত। গ্রন্থসমালোচনা থেকে সেকালের দুজন কৃতী লেখিকার নাম জানা যায়—কৈলাসবাসিনী দেবী ও বামাসুন্দরী দেবী। সম্পাদক উভয়কেই তাঁদের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-রচনার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁদের গ্রন্থগুলি অবশ্য শিশু-পাঠ্য ছিল না। কারণ কৈলাসবাসিনীর গ্রন্থখানি সম্পাদকের ভাষায়

> 'অমায়িক ও ভাবুকচিত্তে ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় আলোচনা করিলে সহজেই যে সকল আশ্চর্য্য জ্ঞানকৌশল ও ক্ষমতা প্রতীয়মান হয়, তাহার কীর্ত্তন করা এই গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য।

তবুও শিশুপাঠ্য সাময়িকে গ্রন্থখানির সমালোচনা করা হয়। একালে এ রীতি নেই। কৈলাসবাসিনী 'অবোধ-বন্ধু'র অন্যতম লেখিকাও ছিলেন। 'বামাগণের রচনা' নামে একটি বিভাগ পত্রিকাখানিতে থাকতো। মনে হয় পত্রিকাখানির অধিকাংশ রচনাই বিহারীলালের। দ্বিতীয় বৎসরে মাত্র একটি সংখ্যায় একখানি কাঠ-খোদাই ব্লকের ছবি ছাড়া আর কোনও ছবি কোনও সংখ্যায় দেখা

যায় না। শিশুপাঠ্য পত্রিকার মধ্যে 'অবোধ-বন্ধু'তেই প্রথম গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তার পূর্বে আর কোনও শিশুপাঠ্য পত্রিকায় গ্রন্থসমালোচনা আমরা দেখি না। কাজেই বিহারীলালই শিশুপাঠ্য পত্রিকায় গ্রন্থসমালোচনার প্রথম প্রবর্তক।

পত্রিকাখানির রচনাবলীর কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত হোল :

বেকন সন্দর্ভ

পাখীর মধ্যে বাহুড় যেরূপ, চিন্তার মধ্যে সন্দেহ সেইরূপ। বাহুড় সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে উড়িয়া বেড়ায় সেইরূপ যে বিষয় আমরা ভাল জানি না সেই বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হয়। সন্দেহ থামাইয়া রাখা ভাল, অন্ততঃ তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়াও চাহি।

সন্দেহে মন মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় হইয়া উঠে, বন্ধুবান্ধবের সহিত বিচ্ছেদ এবং কার্য্যেরও অনেক ব্যাঘাত জন্মে সুতরাং কাজকর্ম্ম স্থির ও সমভাবে চলিতে পারে না। ইহাতে রাজা যথেচ্ছাচারী ও স্বামী স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাসী হয়; বিজ্ঞ লোকদিগের বুদ্ধির স্থিরতা ও মনের প্রফুল্লতা থাকে না।

বিদ্যা

বিদ্যাব সমান ধন কি আছে সংসাবে,
বিদ্যার গুণের কথা বর্ণিতে কে পারে ॥
বিদ্যাই সবাব মূল কুবুদ্ধি নাশিনী,
জ্ঞানময়ী বিদ্যাদেবী সুবুদ্ধি দায়িনী ॥
যথার্থ বিদ্যার তত্ত্ব যে জন পেয়েছে,
নম্রতার হার সেই গলায পরেছে ॥ ইত্যাদি।

আবার এরকমেরও আছে :

অপূর্ব্ব পতন

…এখন কোথায় সেই পতি প্রতি মতি,
পতিধ্যান, পতিপ্রাণ, পতিমাত্র গতি ;
হায়রে কোথায় সেই পতি ভালবাসা,
সাধিতে পতির প্রিয় অতৃপ্ত লালসা ?

কেবল কি সে সকল বচন চাতুরী,
মধু মধু মধুমাখা মিচিরির ছুরী ?
দেখেছিনু যে প্রণয়, সে কি সত্য নয় ?
হায় তবে আজো কেন দিন রাত হয় ! ইত্যাদি।

কিন্তু 'অবোধ-বন্ধু' যে শিশুচিত্ত হরণে একেবারেই বিফল হয় তা বলা যায় না, যখন রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র পৃষ্ঠায় পত্রিকাখানিতে প্রকাশিত পল ভার্জিনিয়ার অনুবাদ সম্বন্ধে এই উক্তি পাঠ করা যায় :

বাল্যকালে আর একটি ছোট কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। তাহার নাম অবোধ-বন্ধু। ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণদিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি। এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের ও বনের গান বাজাইয়া তুলিত। এই অবোধ-বন্ধু কাগজেই বিলাতী পৌলবর্জিনী গল্পের সরল বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন্ সাগরের তীর ! সে কোন্ সমুদ্র সমীরকম্পিত নারিকেলের বন ! ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা ! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত ! আর সেই মাথায় রঙিন রুমাল-পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙ্গালি বালকের কী প্রেমই জমিয়াছিল !

তবে এই শিশুপাঠকটি ছিলেন অসাধারণ। গ্রন্থখানি ফরাসী থেকে অনুবাদ করেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। তিনিও ছিলেন পত্রিকার অন্যতম লেখক।

অবোধ-বন্ধুকে আমরা পুরাপুরি শিশুপাঠ্য পত্রিকা বলার পক্ষে নয়। পত্রিকাখানির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শিশুদেরও মনোরঞ্জন ও শিক্ষা।

৮॥ অতঃপর ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়, 'জ্যোতিরিঙ্গণ'। তার দ্বিতীয় সংস্করণের নামপৃষ্ঠায় লিখিত আছে :

> 'জ্যোতিরিঙ্গণ' স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগের নিমিত্ত মাসিকপত্র। —ভবানীপুর
>
> কলিকাতা ট্রাকট সোসাইটির যত্নে সাপ্তাহিক সংবাদযন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু দ্বারা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

পত্রিকাখানির ভূমিকার সূচনায় আছে :

> আমোদ ও নীতিশিক্ষা একত্র করিবার নিমিত্ত অনেকেই চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হওয়া সকলের পক্ষে সহজ নহে। ·· আমরা·· ·· বালক-বালিকা ও স্ত্রীগণের এককালীন আমোদ ও নীতিশিক্ষার নিমিত্ত এই পত্রিকাখানির প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ··· এই পত্রেতে বিবিধ উপাখ্যান, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি নানাপ্রকার বিষয় থাকিবে। আমোদ-সহকৃত নীতিশিক্ষাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

পত্রিকাখানি ছিল একরাশ চিত্র সম্বলিত। চিত্রের শিল্পী ছিলেন ইংরেজ। কাঠ-খোদাই করে বিলাতীর অনুকরণে চিত্রগুলি তৈরি করে ছাপা হোত।

পত্রিকাখানির একটি কবিতার নমুনা :

পক্ষীগণ

কিবা পশু, কিবা পক্ষী, কিবা নরজাতি,
সবার অন্তরে স্নেহ করয়ে বসতি।
দেখ, দেখ শিশুগণ! কত না যতনে,
পক্ষীগণ পুষিতেছে আপন সন্তানে। ইত্যাদি।

গদ্যের নমুনা—সিংহের কথা প্রসঙ্গে :

> আফ্রিকার উত্তপ্ত মরুভূমিতে অতি ভয়ঙ্কর সিংহ জন্মিয়া থাকে। ইহাদের আশ্চর্য্য সাহস! মরুভূমির নিকটস্থ জীবজন্তুরা সর্ব্বদা এই সিংহের নিমিত্ত সশঙ্ক হইয়া বাস করে।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ভাষায় আগের পত্রিকাগুলির মতো জড়তা নেই। আর, বাক্যের শেষে কেবল পূর্ণবিরাম চিহ্নই নেই, মধ্যে স্বল্পবিরাম চিহ্নও ব্যবহৃত হয়েছে।

৯॥ উক্ত পত্রিকাখানির নয় বৎসর পরে ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একখানি সচিত্র বালকপাঠ্য পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাখানির নাম 'বালকবন্ধু'। পত্রিকার প্রকাশ-কাল লিখিত আছে—২০শে বৈশাখ, ১৮০০ শক। ইং ১৮৭৮। শকাব্দ ইংরেজী খৃস্টাব্দ থেকে ৭৮ বা ৭৯ বৎসর কম। বালকবন্ধুর সম্পাদনা করতেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। অতএব দেখা যায়, বালকবন্ধুই বাংলার বালকপাঠ্য প্রথম পাক্ষিক সাময়িক পত্র। এর আগে আর কোনও শিশুপাঠ্য পাক্ষিকের সন্ধান আমরা পাই না।

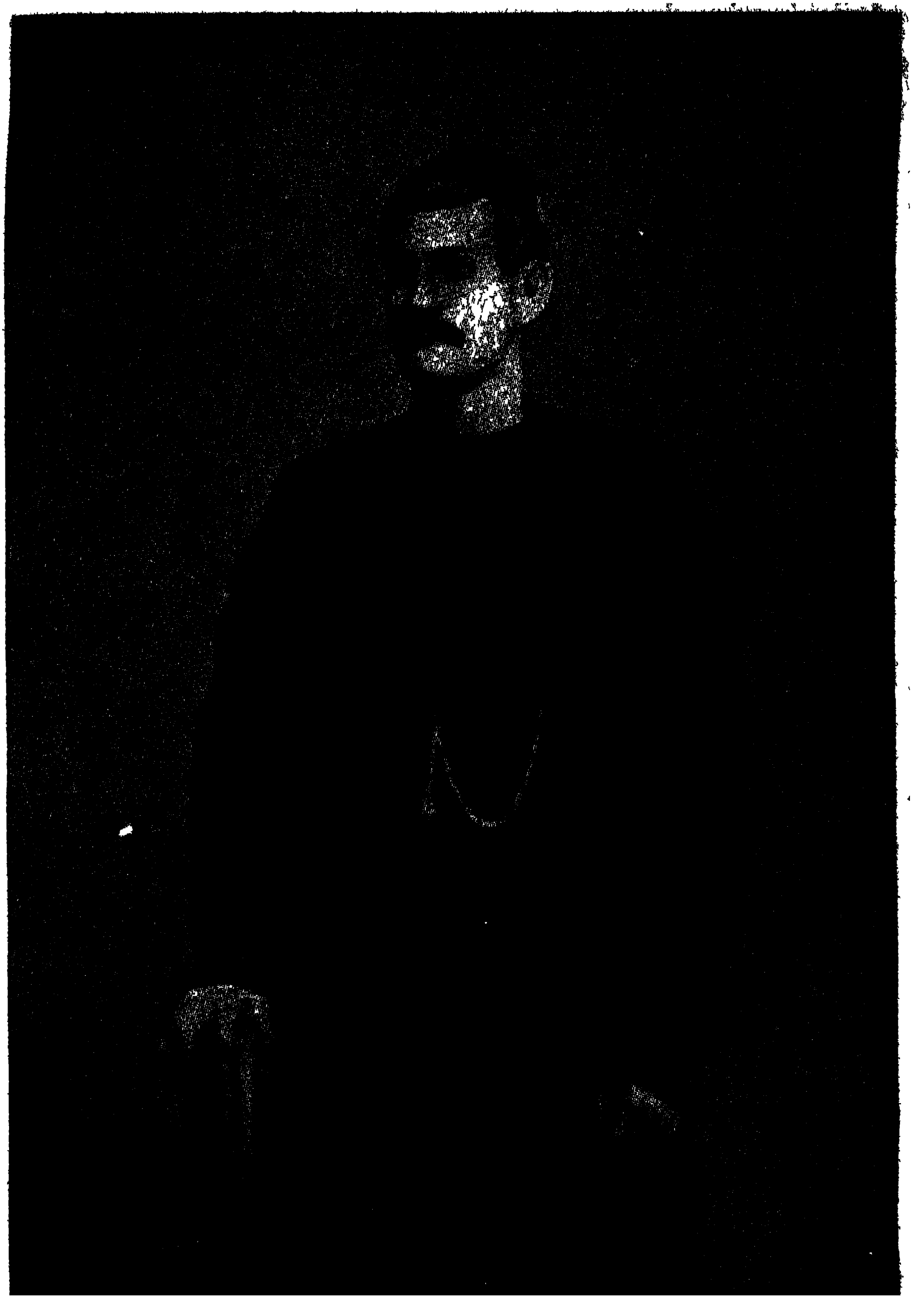
বালকবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল সুকুমারমতি পাঠকগণকে শিক্ষা ও আনন্দ দান। সেজন্য পত্রিকায় নানা বিষয়ের সমাবেশ করা হোত। অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে, প্রায় প্রতি সংখ্যায় দুটি-একটি 'বালকের রচনা' প্রকাশিত হোত। তবে সেগুলি কবিতা। রচনাগুলির একটির কিঞ্চিৎ নমুনা :

মাতৃস্নেহ

মাতার মতন স্নেহ করে কে কখন ?
জননী সমান হায় কে করে যতন।
কতই যতন করে, সন্তানে পালন করে,
কে পারে সহিতে ক্লেশ তাঁহার মতন
সন্তানই যেন তাঁর সমগ্র জীবন।

রচনা শেষে রচয়িতার নাম ও উপাধি কেবলমাত্র আদ্যক্ষরে লেখা থাকতো। তবে কোথাও বয়সের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু স্কুলের নাম থাকতো। বালকেরা কবিতার অনুবাদও করতো।

পাক্ষিকের ২০শ সংখ্যা থেকে প্রথম পৃষ্ঠায় দেশী-বিলাতী 'সংবাদ'



কেশবচন্দ্র সেন

॥ পৃষ্ঠা ১৮ ॥

প্রকাশ আরম্ভ হয়। এই থেকে দেখা যায়, বিংশ শতাব্দীর বালক-বালিকাপাঠ্য সংবাদপত্র বালকবন্ধুতেই প্রথম অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে।

পাক্ষিকের একটি সংবাদের নমুনা :

> একটি নয় বৎসরের বালিকা এদেশী একটি কিরোসিন লাম্প নিবাইতে যায়। নিবাইবার সময় হঠাৎ হাই উঠাতে তাহার একমুখ 'কার্ব্বণ' হইয়া শরীরে প্রবেশ করে। কয় মিনিটের মধ্যেই তাহার পেটের ভিতরে যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং সে একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

পত্রিকাখানিতে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ পরিবেশন করা হোত। কোনও কোনও সংবাদের উপসংহারে সে সম্বন্ধে নীতিকথা থাকতো। সম্ভবত তাই ছিল সম্পাদকের মন্তব্য। কোনও পত্রিকায় পৃথক সম্পাদকীয় স্তম্ভ থাকতো না। পাক্ষিকখানি দীর্ঘকাল চলে না।

১৮৮১ খৃস্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর পাক্ষিক বালকবন্ধু মাসিকরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে পত্রিকাখানির তিরোধান ঘটে। তারপর আবার ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে (১২৯৩ বঙ্গাব্দে) ১ম ভাগ (পাক্ষিক) প্রকাশিত হয়। তারপরও ১৮৯১ খৃস্টাব্দে (১২৯৮ বঙ্গাব্দে) মাসিক আকারে 'নূতন প্রকরণ' প্রকাশিত হয়েছিল।

মাসিক বালকবন্ধুতে দেশী-বিলাতী সংবাদ পরিবেশন করা হোত, এবং তার উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়বস্তুরও কোনও পরিবর্তন হয় না। তবে দু'-একটি ধারাবাহিক গল্প প্রকাশিত হোতে থাকে।

বালকবন্ধুতে প্রকাশিত হোত বিজ্ঞান, গল্প, নীতি, কবিতা, হেঁয়ালী, ব্যাকরণ ও গণিত। কি উপায়ে নির্ভুল বাঙলা লেখা যায় তাও পাঠকগণকে শিক্ষা দেওয়া হোত। আবার কখনও কখনও একটি অনুচ্ছেদের বাক্যাবলীর পদগুলিকে ভেঙে তাদের দু'-একটি বর্ণকে পূর্বের বা পর পদের সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হোত যে, পাঠকালে পাঠকের বিশেষ অসুবিধার ও শ্রোতার মনে প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করতো। এর দ্বারা পাঠকের বাঙলা ভাষায় জ্ঞান পরীক্ষা করা যেতো। প্রতি সংখ্যায় একটি করে সংস্কৃত শ্লোক ও তার সরল ব্যাখ্যা থাকতো।

বালকবন্ধুর ভাষা ছিল প্রায় বিংশ শতাব্দীর বাঙলা ভাষার মতো এবং যে ভাষায় পত্রিকাখানি লেখা হোত তা সহজ, সরল ও সুমিষ্ট।

বালকবন্ধুর প্রতিসংখ্যায় থাকতো কাঠ-খোদাই ব্লকে ছাপা কয়েকখানি এক-রঙা ছবি। কিন্তু সেগুলির শিল্পী কে তা জানা যায় না। বলতে গেলে বালকবন্ধু থেকেই শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকাজগতে নূতনের উদয় হয়।

আনন্দ ও বিস্ময়ের কথা যে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৩ খৃস্টাব্দ এই চার বৎসরে বাংলা দেশে আরও ছ'খানি বালক-বালিকাপাঠ্য সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। মাসিক বালকবন্ধুর সমসাময়িক ছিল :

১০ ॥ 'বালক হিতৈষী।' পত্রিকাখানি ছিল মাসিক এবং ১৮৮১ খৃস্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২৮৮, কার্তিক মাসে) প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানির পরিচালক ছিলেন, জানকীপ্রসাদ দে।

১১ ॥ আবার, ঐ ১৮৮১ খৃস্টাব্দের নভেম্বরে প্রকাশিত হয়, 'আর্য্যকাহিনী'। পত্রিকাখানি ছিল সাপ্তাহিক। এইখানিই বাংলার বালক-বালিকাপাঠ্য প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা। কারণ এর আগে আর কোনও সাপ্তাহিকের সন্ধান আমরা পাই না।

১২ ॥ এই পত্রিকাখানির দু'বৎসর পরে ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে ১লা জানুয়ারী আবির্ভূত হয় সেকালের বাংলার বালক-বালিকাগণের প্রিয়, 'সখা'। 'সখা' ছিল মাসিক পত্রিকা। প্রথম তিন বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দ অবধি সখার সম্পাদক ছিলেন প্রমদাচরণ সেন। তিনিই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। পত্রিকাখানির জন্য তিনি প্রভূত ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেন। অথচ তিনি ছিলেন দরিদ্র। দুর্ভাগ্য যে, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের ২১শে জুন অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন থেকে অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে তৃতীয় বর্ষের ৭ম সংখ্যা জুলাই থেকে, ১৮৮৬ খৃস্টাব্দ অবধি চতুর্থ বর্ষটি 'সখা'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। তাঁর পরে এক বৎসর ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে সখা পরিচালনা করেন অন্নদাচরণ সেন। তিনি পত্রিকাখানির পরিচালনভার পরিত্যাগ করলে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সখার সম্পাদনভার গ্রহণ করে

পত্রিকাখানিকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁরই যত্নে সখা তিন-চার বৎসর জীবিত থাকে। অবশেষে সখার কৈশোরেই মৃত্যু হয়। তারপর প্রায় চার বৎসর কেটে যায়। ভুবনমোহন রায় ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশ করেন 'সাথী'। তার আগে জুড়ে দেন সখার প্রিয় নামটি। তখন হয় 'সখা ও সাথী'। সাথীদের কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

রচনাসম্ভারে 'সখা' বাংলাব শিশুচিত্ত এতখানি লুঠে নিয়েছিল যে, আজও এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও অনেক শিক্ষিত বাঙালী তাকে স্মরণ কবে থাকেন। বস্তুত সখাই প্রথম শিশু ও কিশোরোপযোগী পত্রিকা।

যে উপেন্দ্রকিশোর বায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার বালক-বালিকাদের হাতে মনোলোভা 'সন্দেশ' দিয়ে তাদের আনন্দবর্ধন করতেন, তিনি ছিলেন সখাব অন্যতম প্রধান লেখক। তখন তিনি ১৬।১৭ বৎসরেব কিশোর। প্রথম দিকে সখাকে সুন্দব রচনাসম্ভারে সাজাতেন সম্পাদক মহাশয়, তিনি ও মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আবও অনেকে।

আরও একটি মজার কথা এই যে. সখার ষষ্ঠ সংখ্যায় বিখ্যাত মনীষী ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল 'সুবেন্দ্রবাবুর কারাবাস' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতে তিনি সুবেন্দ্রবাবুব (সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের) হাইকোর্টে বিচার, কারাবাসের কারণ ও চরিতকথা অতি সহজ ভাষায় বর্ণনা করেন। প্রবন্ধটিব উপসংহারে আছে :

> পাঠক! পাঠিকা! তোমার হতভাগ্য জন্মভূমির জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিতে শেখ! একদিন তোমার দ্বারাও ভারতের কারাগার পবিত্র হইবে, একদিন তোমাব নিজের ক্লেশে দেশের দুর্গতি দূর হইবে। একদিন তোমার গৌরবেও তোমার জাতির মুখ উজ্জ্বল হইবে।

শিশুপাঠ্য পত্রিকায় এই প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ।

সখাও তার পূর্ববর্তিনীগণের মতোই গল্প, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে সমৃদ্ধ থাকতো। বালকবন্ধুর প্রদর্শিত পথে চললেও সখার অনেকগুলি

বৈশিষ্ট্য ছিল। সেগুলির মধ্যে বিদেশী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সচিত্র চরিতকথা ছিল অন্যতম। সখার চিত্রগুলিও কাঠ-খোদাই করে ছাপা হোলেও ছিল স্পষ্ট ও চমৎকার।

প্রমদাচরণ ছিলেন উদার ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন। তাঁর রচনায় ও সমগ্র পত্রিকাখানিতে তার প্রচুর পরিচয় মেলে। আর, তাঁর রুচিও ছিল উন্নত। চাষী, অনুন্নত শ্রেণী ও দরিদ্রের প্রতি তাঁর দরদ ছিল গভীর।

সখা কয়েকটি স্তম্ভে গঠিত ছিল। এই সকল স্তম্ভে পাঠক-পাঠিকাগণকে পোশাক, আচার-ব্যবহার, স্বাস্থ্য ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হোত। মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীও কোনও কোনও সংখ্যায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শিখানো হয়েছে। বালকবন্ধুতেও এরকম প্রয়াস দেখা যায়। প্রথম সংখ্যাতেই পাঠক-পাঠিকাদের পত্র ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার রীতির ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সমালোচনার প্রবর্তন হয়। ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ নামক স্তম্ভে দেশী-বিলাতী সংবাদ প্রকাশিত হোত। মন্তব্যসহ সম্পাদক যা লিখতেন তাকে সম্পাদকীয় বলা যেতে পারে। তবে আজকালকার সাময়িকীর অবিকল রূপ তার ছিল না।

প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক পত্রিকা প্রকাশের কৈফিয়তে লিখেছেন :

> এতদিন পরে সখা প্রকাশিত হইল। এইরূপ পত্রিকা আমাদের দেশে নাই বলিয়াই আমরা এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

এবং পত্রিকার লক্ষ্য সম্বন্ধে লিখেছেন :

> এই পত্রিকায় লিখিত গল্প প্রভৃতির দ্বারা বালক-বালিকাদের চরিত্রের বিকাশ এবং জ্ঞানের বিস্তার করাই আমাদের লক্ষ্য।

তাই স্বয়ং সম্পাদক মহাশয় ‘ভীমের কপাল’ নামে একখানি সুন্দর উপন্যাস প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক লিখে দশম সংখ্যায় সমাপ্ত করেন। উপন্যাসের নায়ক মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন নন, এক বাঙালী কিশোর। তাকে নানা অবস্থার মধ্যে ফেলে শোধন

করা ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। রচনাটিতে তখনকার বাংলার মফঃস্বল শহর ও গ্রামের চিত্র দেখা যায়। এইখানিই বাংলার শিশুপাঠ্য পত্রিকার পাতায় প্রথম কিশোরপাঠ্য মৌলিক উপন্যাস। এর আগে আর কোনও কিশোরপাঠ্য উপন্যাসের সন্ধান আমরা পাই না।

'ঠাকুরদার আসর' নামে একটি আসর ছিল। এই আসরে গল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হোত। আসরের 'ঠাকুরদাদাটি' ছিলেন, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। কিশোরবয়স্ক উপেন্দ্রকিশোরও বিজ্ঞান-বিষয়ক নিবন্ধ লিখতেন।

সখায় নানা রকমের ধাঁধা থাকতো। যে সবচেয়ে বেশি উত্তর দিতে পারতো তাকে পুরস্কার দেওয়া হোত।

সখার গদ্য ও পদ্যের কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া হোল :

পদ্য : শরদের নিশি

কাননে ফুটেছে ফুল,
গগনে ফুটেছে তারা,
শরদের নিশিখানি,
হাসিতেছে মুখভরা।

গদ্য :

সে প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা। ক্লউপ সাগরে একটি সীলের ছানা ধরা পড়ে। সমুদ্রের ধারে একটি ভদ্রলোক থাকিতেন। তিনি তাহাকে রান্নাঘরে রাখিয়া পুষিতে লাগিলেন।

এই সীলটি ছিল অন্ধ।

উপরোক্ত গদ্য-পদ্যের ভাষা কত সাবলীল! পূর্ববর্তিনী পত্রিকা-গুলির চেয়ে 'সখা' ছাপা, ছবি ও রচনাশৈলীতে ছিল অনেকটা উন্নত। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে সখা শিক্ষালাভ করে লাভবান হয়েছিল। সখার কার্যালয় ছিল—৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩॥ ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২৯০, ভাদ্র মাস) ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়, 'বালিকা'। পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন, অক্ষয়-কুমার গুপ্ত।

১৪ ॥ *এই বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে* 'বারাণসী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়' থেকে প্রকাশিত হয়, 'সুনীতি'। এখানিও ছিল মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল 'বালক ও যুবকবৃন্দের হৃদয়ে আর্য্য রীতিনীতির প্রবর্তনা ও আর্য্যভাবের উদ্দীপনা।' এই মহৎ কার্যে পত্রিকাখানি কতদূর সাফল্য লাভ করে তা জানা যায় না, তবে যখন সে এক বৎসরের শিশু তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এ কথা জানা যায়। পত্রিকাখানির পরিচালক ছিলেন, ভূধর চট্টোপাধ্যায়।

১৫ ॥ আবার এই বৎসরেই রেভাঃ জে. ই. পেন-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, 'বাল্যবন্ধু'। বন্ধুটির উদ্দেশ্য ও কার্য ছিল বালক-বালিকাদের মধ্যে খৃস্টতত্ত্ব প্রচার। এই পত্রিকার প্রকাশকাল, ১৮৮৩ (বঙ্গাব্দ ১২৯০, কার্তিক)। বলা বাহুল্য উপরোক্ত প্রচারমূলক পত্রিকা দুখানি জনপ্রিয় হয় না।

শিশু-সাহিত্যের রূপ কেমন হওয়া উচিত, এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যে হবে এমন সম্ভাবনারও যথেষ্ট কারণ আছে। তবুও শিশু-সাহিত্যিক ও অপরাপর সাহিত্যিকগণ সমালোচকের মন্তব্য উপেক্ষা করে নিজেদের খেয়ালে এ সাহিত্য সর্বকালেই রচনা করে যাবেন। দেখা যায়, এক সময়ে যা বয়স্কগণের পাঠ্য ছিল, পরবর্তীকালে তাই শিশু-সাহিত্য হয়েছে। আবার বিপরীতটাও যে কখনও কখনও ঘটে নি এমনও নয়। পূর্বে অবোধ-বন্ধুতে তা দেখা গেছে। আবার পরেও তা দেখা যায়। নিম্নে তার একটি প্রমাণ দেওয়া গেল।

১৬ ॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় বাংলার বালক-বালিকাদের জন্য ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে—১৮৮৫ খৃস্টাব্দে—'বালক' নামে যে সুন্দর মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় তার কথা অনেকেরই মনে আছে। এই পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা ছিল, রবীন্দ্রনাথের 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।' আবার এই বালকেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের

'রাজর্ষি' নামক উপন্যাস। এখানিকে কেউই শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেন না।

বালকও ছিল সচিত্র, কিন্তু ছোট অক্ষরে মুদ্রিত হোত। আমরা পূর্বের অনেকগুলি বালক-বালিকাপাঠ্য পত্রিকা বড় অক্ষরে মুদ্রিত দেখেছি। বালকের অধিকাংশ লেখক ছিলেন ঠাকুরগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তবে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'ঠগী' কাহিনীর রচয়িতারূপে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম দেখা যায়। ইনি হাস্যরসাত্মক রচনায় পারঙ্গম সুপ্রসিদ্ধ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কি না জানি না। অন্তত এই রচনাটিতে হাস্যরস নেই। অবিশ্যি ঠগীদের কাণ্ডকারখানা মনে হাস্যরসের পরিবর্তে আতঙ্কেরই সৃষ্টি করতো এবং তার কাহিনী আজও তা করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'হেঁয়ালী' নাটিকাগুলি, যা আজকাল বালক-বালিকারা অভিনয় করে, কখনও কখনও প্রাপ্তবয়স্কগণও করেন, বালকেই প্রথম প্রকাশিত হয়। বালকের আগে আর কোনও শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রে আমরা নাটক প্রকাশিত হোতে দেখি না।

রবীন্দ্রনাথের নাটিকাগুলির পূর্বে বাংলার বালক-বালিকাগণের জন্য আর কেউ নাটক রচনা করেছিলেন এমন প্রমাণ আমরা পাই না। ঐ সকল নাটক বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের হাস্য-কৌতুক নাটিকাগুলির অন্তর্গত। কতকগুলির মধ্যে প্রচুর শ্লেষ আছে যার ফলে হাস্য-রসসৃষ্টি হয়ে থাকে।

বালকেও বিজ্ঞান, ইতিহাস, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ ও নাটক ইত্যাদি প্রকাশিত হোত। কিছু 'খবরাখবর' থাকতো এবং বালক-বালিকার রচনাও স্থান পেতো। ব্যায়ামের রীতিও শিখানো হোত। বালকেও গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়েছে। 'প্রভু যীশুখৃস্টের নূতন নিয়ম' নামক একখানি গ্রন্থের সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যারা ধাঁধার উত্তর দিত কোনও কোনও সংখ্যায় তাদের নাম প্রকাশিত হোত। এরূপ একটি সংখ্যায় মাত্র ১৪টি নাম প্রকাশিত হয়েছে।

'বালকে' প্রকাশিত বালক-বালিকাদের জন্যে রচিত দু'-একটি গদ্য ও পদ্যের কিঞ্চিৎ নমুনা :

> ক ॥ অর্থাৎ বাতিকের আবশ্যক। আমাদের শ্লেষ্মা-প্রধান ধাত, আমাদের বাতিকটা আদবেই নাই। আমরা ভারি ভদ্র, ভারি বুদ্ধিমান, কোন বিষয়ে পাগলামি নাই। আমরা পাশ করিব, রোজকার করিব ও আমরা খাইব।

> খ ॥ নিদাঘ-তপন শুষ্ক ম্রিয়মান লতার মতন
> ক্রমে অবসন্ন হোয়ে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে,
> চারিদিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আঁখি করি উন্মীলন
> বন্ধুহীন—প্রাণহীন—জনহীন—মরু মরু মরু—

এইরূপ রচনা অসাধারণ বালক-বালিকাদের জন্যই রচিত হোত মনে হয়। 'বালক' এক বৎসব পরে প্রাপ্তবয়স্কদের পত্রিকা 'ভারতী'র সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৭ ॥ অতঃপর 'শিক্ষা' নামক একখানি মাসিক পত্রিকার কথা জানা যায়। পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন বনগ্রামের ছাত্রসমিতি ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে। পত্রিকাসম্পাদক ছিলেন, প্রিয়নাথ বসু।

১৮ ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিশুবান্ধব' নামক একখানি মাসিক পত্রিকার সন্ধান দিয়েছেন বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থ তালিকার উল্লেখ করে। তাঁর অনুমান, পত্রিকাখানি ১৮৯০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাসম্পাদক ছিলেন, জি. এইচ. রুজ। পত্রিকাখানির রচনা ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

১৯ ॥ ১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে—১৮৯৩ খৃস্টাব্দে—মধুগুপ্তের লেন থেকে প্রকাশিত হয় 'সাথী'। এর সম্পাদক ছিলেন ভুবনমোহন রায়।

প্রথম সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় কার্যাধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র সেন লিখছেন :

> 'সাথী' প্রকাশিত হইল। বালক-বালিকাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষাই সাথীর লক্ষ্য। আদর্শ জীবন চরিত, মনোহর গল্প, কবিতা, সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের কথা, ইতিহাসের কথা এবং

বিবিধ প্রকার ব্যায়াম ও খেলার কথা এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সাথীতে লেখা হইবে।

…কথায় যাহা পরিষ্কার না হইবে, চিত্রাদি দ্বারা তাহা বুঝান হইবে; চিত্রের বিষয় আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। ইত্যাদি।

'সাথী'র প্রকাশিত বিষয়বস্তুর কথা কার্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের বিবৃতিতেই জানা গেল। সাথীতেও বালকদের রচনা প্রকাশিত হোত এবং রচনা প্রতিযোগিতায় সর্বোৎকৃষ্ট রচনা পুরস্কার লাভ করতো। একবার প্রথমজনকে পুরস্কার দেওয়া হয় পকেট ঘড়ি, দ্বিতীয়কে টাইমপিস। বালক বয়সে মাইকেল-চরিতকার যোগেন্দ্রনাথ বসুও সাথীতে কবিতা লেখেন। তার কিঞ্চিৎ:

বিচার আসনে বসি আছে সিংহরাজ
বিচার হইবে দুষ্ট শৃগালের আজ।
বামে বসি রাজমন্ত্রী সভাসদ যত,
দক্ষিণেতে উকিল কৌঁসুলী দেখ কত।
হেন অত্যাচার রাজার সহ্য নাহি হয়
অধর তাঁর কাঁপছে রাগে চক্ষু রক্তময়।
শৃগাল বলে,
মিথ্যা কথা বলছে বৃদ্ধ মেষ
'আমি কি কভু একটা ভেড়া করতে পারি শেষ?'

সাথীর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথমেই অমর-যশা শিশু-সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় একটি কবিতায় 'আবাহন' করছেন—

কোথা আছ
ভাইটি আমার কোথা আছ বোন,
আয় ছুটে
আয় শোনরে এসে সাথীর আবাহন …ইত্যাদি।

সাথীর ভাষা পূর্ববর্তিনী পত্রিকাগুলির চেয়েও সহজ ও সাবলীল। চিত্রগুলি আগের মতোই কাঠ-খোদাই করে ছাপা হোলেও স্পষ্ট ও সুন্দর।

৭ম সংখ্যায় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের 'বেচারাম ও কেনারাম' নামে সুন্দর একখানি সচিত্র নাটিকা প্রকাশিত হয়। চিত্র কয়খানি সম্ভবত তাঁরই আঁকা।

আর, ৮ম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই মনীষী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় একটি সুন্দর উপদেশ দিয়ে তার উপসংহারে লিখছেন :

> প্রকৃত জ্ঞানীর প্রধান লক্ষণ এই যে, তিনি বাল্য ভাব-বিশিষ্ট। অতএব তোমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, হে বালক! হে শ্রেষ্ঠজ্ঞানী! হে ঋষি! হে দেবতা! তোমাকে নমস্কার করি।

বসু মহাশয় তখন থাকতেন 'দেবগৃহে' (দেওঘরে)। সাথীর গদ্যের কিঞ্চিৎ নমুনা :

> কুরুক্ষেত্রে উঞ্ছবৃত্তি নামে এক তপস্বী ছিলেন। (পাদটীকায় 'উঞ্ছ' কাকে বলে তা বোঝানো হয়েছে।) তিনি সেখানে পর্ণ কুটীরে স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত তপস্যা করিতেন। প্রতিদিন উঞ্ছদ্বারা ব্রাহ্মণ যাহা কিছু পাইতেন অপরাহ্নে সপরিবারে তাহাই ভোজন করিতেন।

এই রচনাটির রচয়িতা ছিলেন পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন।

আজকাল বালক-বালিকাপাঠ্য সাময়িক পত্রিকায়ও ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু 'সখা'তেই বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রথম রেওয়াজ আরম্ভ হয়। সাথীতেও এই রীতির অনুসরণ করা হয়।

২০॥ প্রকাশের এক বৎসর পরে সাথীর সঙ্গে সখা যুক্ত হয়। তখনই নাম হয় 'সখা ও সাথী'। ভুবনমোহন রায়ই ছিলেন তার সম্পাদক। সখা ও সাথীর প্রকাশকাল—১৮৯৪ খৃস্টাব্দ।

সখা ও সাথী রচনায় আরও উৎকর্ষ লাভ করে, কিন্তু বিষয়বস্তুর বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে নাম দেখা যায় জলধর সেন, জগদানন্দ রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সখা ও সাথীর পাঠক-পাঠিকাগণকে দেওঘর থেকে একটি সংখ্যায় 'নারিকেল বৃক্ষের উপদেশ'

নামে একটি রচনা পাঠিয়েছিলেন। সখা ও সাথীতে মনীষীদের চরিত-কথাও গল্পের মতো কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হোত। কয়েকটি সংখ্যায় হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত 'আশ্চর্য্য হত্যাকাণ্ড' নামে একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। এইটিকে উনবিংশ শতাব্দীর বালক-বালিকাপাঠ্য সাময়িক পত্রিকায় প্রথম 'থ্রিলার' বলা যেতে পারে। এ যুগে এই সাহিত্যের প্রাচুর্য এবং কুফল দেখে অনেকেই এর বিরোধী হয়ে উঠেছেন।

২১॥ ১৮১৮ খৃস্টাব্দে 'দিগ্দর্শন' বাংলার শিশু-সাহিত্যক্ষেত্রে যে বীজ বপন করে তা সাতাত্তর বৎসরে অঙ্কুরিত হয়ে শাখায় পল্লবে সুশোভিত এবং সুগন্ধি মনোরম কুসুমে কুসুমিত হয়ে ওঠে মাসিক 'মুকুলে'। সে কুসুমের বর্ণ, সুষমা ও সুরভিতে বাংলার শিশুচিত্ত পুলকিত ও মুগ্ধ হয়। ১৩০২ বঙ্গাব্দের আষাঢের নব মেঘোদয়ে হয় 'মুকুলে'র প্রথম প্রকাশ। তখন ইংরেজী ১৮৯৫ খঃ অঃ। মুকুলও ছিল সচিত্র ও সুমুদ্রিত।

আমাদের বাংলার সাহিত্যকে যাঁরা বিবিধ মণি-রত্নে ঐশ্বর্যময় করে গেছেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন, 'মুকুলে'র লেখক। যেমন, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, আচার্য যোগেশচন্দ্র, গিরীন্দ্র-মোহিনী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি। শেষোক্তজন ছাড়া আর সকলেই আজ পরলোকে। আর, সম্পাদক স্বয়ং শাস্ত্রীমহাশয় তো—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—তাঁর সুললিত রচনায় মুকুলের প্রতি সংখ্যাকে সরস করতেনই।

প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনায় তিনি লিখেছেন :

> মুকুল নামটা বেশ। মুকুল বলিলেই অনেক কথা মনে হয়। প্রথম মনে হয়, আশা। যাহা আজ মুকুলে আছে, কালি তাহা ফুটিবে। মুকুল আসিয়াছে, পশ্চাতে ফুল ও ফল আসিতেছে। এই জন্যই মুকুল দেখিলেই সকলের আনন্দ; মুকুল দেখিলেই বোঝা যায়, এ বৎসর ফলটা কেমন হইবে। ইত্যাদি।

আবার, দ্বিতীয় সংখ্যার প্রারম্ভেই তিনি জানাচ্ছেন, 'মুকুল কাহাদের জন্য ?' তিনি লিখছেন :

> মুকুল সম্পূর্ণরূপে ছোট শিশুদের জন্য নহে। যাহাদের বয়স ৮।৯ হইতে ১৬।১৭র মধ্যে ইহা প্রধানতঃ তাহাদের জন্য।

বস্তুত কেবলমাত্র ৮।৯ বৎসরের শিশুদের জন্য কোনও পত্রিকা আজ অবধি প্রকাশিত হয় নি, যদিও বা ছ'-একখানি হয়ে থাকে, তাও অল্প-কালের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে। আমাদের যতটা মনে হয়, এর প্রধান কারণ আর্থিক। তবে 'মুকুলে' যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়দ্বয়ের অনেকগুলি সুন্দর সচিত্র কবিতা বাস্তবিকই ৮।৯ বৎসরের বালক-বালিকাগণের উপযোগী ছিল। আজও সেগুলি সানন্দে পঠিত হয়।

মুকুলও তার পূর্ববর্তিনীগণের মতোই গল্প, কবিতা, বিজ্ঞান, চরিত-কথা, ভ্রমণ, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও ধাঁধা ইত্যাদিতে পূর্ণ থাকতো। জীবজন্তুর কথা থাকতো আগের চেয়ে অনেক বেশি। সম্পাদক মহাশয় পাঠকমহলের প্রশ্ন ও পত্রের সরস উত্তর দিতেন। কোনও কোনও গ্রাহক তাঁকে 'গালাগালি' দিয়ে পত্র দিত। তিনি তারও সরস উত্তর দিয়ে তাকে শিক্ষা দিতেন ও অপর পাঠকগণকে হাস্যরস বিতরণ করতেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের 'মুকুলে' পাঠক-পাঠিকাগণের উদ্দেশ্যে হাস্যরসে-ভরা কবিতায় ও কৌতুক চিত্রে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল সে ছুটি ও অপরাপর রচনার কিঞ্চিৎ নমুনা নিষ্প্রয়োজনবোধে উদ্ধৃত হোল না। অবিশ্যি মুকুলের অনেক রচনা—যেমন জগদীশচন্দ্রের 'গাছের কথা', শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের গল্প 'আবু করিমের চটি জুতা' বালক-বালিকারা আজও পাঠ করে থাকে।

মুকুলেও বালক-বালিকাদের রচনা প্রকাশিত হোত। ২য় বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়—দ্বিতীয় বর্ষ থেকে বৈশাখেই বর্ষারম্ভ হোত—একটি আট বৎসর বয়সের শিশুর বর্ণনাত্মক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। শিশুটির পরিচয় 'শ্রীসুকুমার রায় চৌধুরী (বয়স ৮ বৎসর)' এইরূপ লেখা আছে।

কবিতাটির নাম 'নদী'। কবিতাটি এই :

হে পর্ব্বত যত নদী করি নিরীক্ষণ,
তোমাতেই করে তারা জনম গ্রহণ।

ছোটবড় ঢেউ সব তাদের উপরে,
কল্ কল্ শব্দ করি সদা ক্রীডা করে,
সেই নদী বেঁকে চুরে যায় দেশে দেশে,
সাগরেতে পড়ে গিয়া সকলেব শেষে।

পথে যেতে যেতে নদী দেখে কত শোভা,
কি সুন্দর সেই সব কিবা মনোলোভা।

কোথাও কোকিলে দেখে বসি সাথী সনে,
কি সুন্দব কুহু গান গায় নিজ মনে।

কোথাও মযূবে দেখে পাখা প্রসারিযা
বনধারে দলে দলে আছে দাঁডাইয়া।
নদী তীরে কত লোক শ্রান্তি নাশ করে,
কত শত পক্ষী আসি তথায় বিচরে।

দেখিতে দেখিতে নদী মহাবেগে যায়,
কভুও সে পশ্চাতেতে ফিরে নাহি চায়।

এই শিশুই পরবর্তীকালের হাস্যরসে মধুময়, অনুপম নাটিকা ও কবিতাবলীর রচয়িতা 'সুকুমার রায়'। তবে সুকুমারের সকল রচনার মর্মকথা শিশুদের বোধগম্য হওয়া সহজ নয়। এ বিষয়ে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করেছি।

তৃতীয় বর্ষে একটি সংখ্যায় বালকদের রচনা বিভাগে একটি কবিতার জন্য শ্রীযুক্ত বারীন ঘোষ মহাশয় পাঁচ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। একথা তাঁর স্মরণেও থাকতে পারে।

শাস্ত্রীমহাশয়ের পরে হেমচন্দ্র সরকার এবং তারপরে আরও কয়েকজনের সম্পাদনায় মুকুল প্রকাশিত হয়। মুকুলের একটি পরিচালকমণ্ডলী ছিলেন কিন্তু সম্পাদকমণ্ডলী ছিলেন না।

২২ ॥ মুকুলের পর বঙ্গাব্দ ১৩০৩—খৃঃ অঃ ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত

গুরুপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'শৈশব সখা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার কথা জানা যায়।

২৩॥ তারপর চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গাব্দ ১৩০৫ সালের ১লা বৈশাখ —১৮৯৮ খৃস্টাব্দে—প্রকাশিত হয় 'অঞ্জলি' নামক শিক্ষা-বিষয়ক একখানি মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন রাজেশ্বর গুপ্ত।

কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথমে সম্পাদকের 'নিবেদনে' আছে :

> প্রায় চারি বৎসর হইল, অঞ্জলির অনুষ্ঠানপত্র বাহির করিয়াছিলাম। কিন্তু দৈব ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন সংকল্পিত সময়ে 'অঞ্জলি' প্রকাশ করিতে পারি নাই।

কিন্তু অনুষ্ঠানপত্র ও পত্রিকা এক নয়। কাজেই পত্রিকাখানি ১৮৯৮ খৃঃ অব্দেই প্রকাশিত হয়েছিল বলা যায়। প্রথম সংখ্যার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদক পত্রিকাখানি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখছেন :

> এইখানি শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্রিকা, বালক-বালিকাদিগকে সুশিক্ষিত করা ইহার প্রাণ। আমি একাকী এই ব্রত উদ্‌যাপন করিব বলিয়া গ্রহণ করি নাই এবং করিতে পারিব বলিয়াও মনে করি না। সকলের সমবেত চেষ্টা না হইলে একটি সামান্য পিনও প্রস্তুত হয় না। ইত্যাদি।

অতঃপর ভাদ্র সংখ্যার নামপৃষ্ঠা থেকে লেখা হোতে থাকে 'মাসিক পত্র ও সমালোচনা'। বস্তুত তখন থেকে প্রতি সংখ্যাতেই মৃদু সমালোচনা থাকতো। একবার ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 'উড়িয়া বর্ণলিপি' সম্বন্ধে তাঁর যে নিজস্ব মত তাঁর বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় তা বেশ যুক্তি ও প্রামাণ্য গ্রন্থের উক্তি দিয়ে নস্যাৎ করা হয়েছিল।

পত্রিকাখানির 'প্রাণ' ছিল বালক-বালিকাদিগকে সুশিক্ষিত করা। বলতে দুঃখ হয় এই 'প্রাণ' ছিল কঠোর। কারণ দু'-একটি গল্প ও একটি মাত্র কবিতা ছাড়া আর সবই ছিল শুষ্ক প্রবন্ধ। আবার প্রবন্ধাবলীর বিষয়ও ছিল এমন যে, তার প্রতি সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণের সাধারণত কৌতূহলের অভাব দেখা যায়। জানি না

তখনকার বালক-বালিকাদের কাছে পত্রিকাখানি কতটা প্রিয় হয়েছিল। মনে হয়, পত্রিকাখানি তাদের চেয়ে তাদের অভিভাবক ও শিক্ষক-গণেরই উপযোগী হয়েছিল বেশি। তাঁদের প্রতি বহু উপদেশ এবং বাংলার শিক্ষাবিভাগের বহু সংবাদ এতে প্রকাশিত হোত, তবে কোনটাই গুপ্ত সংবাদ নয়।

আমরা বৈশাখ থেকে চৈত্র, এক বৎসরের বারোখানি সংখ্যার যে সমষ্টিবদ্ধ গ্রন্থ দেখেছি তাতে প্রবন্ধ লেখকগণের নাম জানবার সুযোগ পাই নি। কারণ তাব সূচীও নেই, প্রবন্ধের উপরে বা নিচে কারও নামও দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, পত্রিকাখানি সচিত্র ও সুরুচির পরিচায়ক ছিল না। এতে 'তত্ত্ব খবব' ও নানা কথায় তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করা হোত। আবার, পৃথক প্রবন্ধাবলীও থাকতো। 'তত্ত্ব খবব' অনেকটা ছিল আজকালকার সাধাবণ জ্ঞান-বিষয়ক অনুচ্ছেদের মতো। 'নানা কথায়' স্বদেশের ও বিদেশের বহু ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও বিজ্ঞান-বিষয়ক অনুচ্ছেদ থাকতো।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'চীন পবাধীন-পরতাব পরিণাম' নামক একটি প্রবন্ধে চীনেব মহান ঐতিহ্যময় অতীত সম্বন্ধে ও তার দুরবস্থার কথা অত্যন্ত সহানুভূতিব সঙ্গে আলোচনা কবা হয়েছে এবং উপসংহারে চীনকে আহ্বান কবে বলা হয়েছে :

> নব বিজ্ঞানালোকে জাগরিত হও, বাতগর্ভ অভিমান দূর কর, যাহা দেখ নাই দেখিতে পাইবে, যাহা শুন নাই শুনিতে পাইবে। আব সে চীন থাকিবে না, নব পৃথিবীতে নূতন চীন হইবে।

সুখের কথা যে চীন আজ সত্যই মহাচীন হয়ে উঠছে।

অঞ্জলির বালক-বালিকা পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি প্রবন্ধের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল :

> বাইরনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয় পরিতোষক গানের পরিবর্তে টেনিসনের ধর্মপ্রাণ নীতিশাসনের মিষ্টতর সঙ্গীত সকল প্রাণকে সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে প্রকাশিত—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবিশ্যি এরই মধ্যে দু'-একটি মরূদ্যান ও মরুকুসুমও যে না আছে তা নয়। যেমন,

> একদা এক দেবী মানবী ধূলি ধূসবিত একটি শিশুকে যত্ন-পূর্ব্বক কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া স্বীয় বসনাঞ্চলে ধূলি ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিতেছেন—
>
> সোনার বেনে সোনার বেনে
> সোনাব জানে মূল।
> অন্ধেব দুযাবে সোনা বাঙ সমতুল ॥ ···
>
> কবিতাটি শেষ হইলে ধূলি ঝাড়া শেষ হইল।

২৪ ॥ অতঃপর বঙ্গাব্দ ১৩০৫ সালের শ্রাবণে—১৮৯৮ খৃঃ অঃ—প্রকাশিত হয় 'কুসুম'। পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন কতকগুলি ছাত্র। ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখানিব সন্ধান দিয়েছেন ১৮৯৯ খৃস্টাব্দের 'প্রয়াসের' উল্লেখ করে।

২৫ ॥ উনবিংশ শতকের শেষ বৎসরেই ১৩০৭ বঙ্গাব্দ ১লা বৈশাখ —১৯০০ খৃঃ অঃ—বসন্তকুমাব বসু প্রকাশ করেন 'প্রকৃতি' নামক একখানি মাসিকপত্র। পত্রিকাখানির নামপৃষ্ঠায় মুদ্রিত থাকতো 'Under the supervision of Students'. প্রকাশক মহাশয পত্রিকাখানি প্রকাশের যে চাবটি উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেগুলিব দ্বিতীয়টির কিঞ্চিৎ পাঠেই জানা যায় ছাত্রগণের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধিব মহৎ সংকল্প তাঁদের ছিল। তিনি লিখছেন :

> ······ইহার প্রথম উদ্দেশ্য ছাত্রগণের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করা। অধিকাংশ ছাত্রেরা বাঙ্গালা ভাষায় ভাল লিখিতে পারেন না। এ দোষ তাঁহাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িতেছে—দিন দিন অলক্ষ্যে তিল তিল করিয়া তাঁহাদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করতঃ মাতৃভাষালোচনার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই অসুবিধা নিরাকরণ মানসে এত মাসিক পত্রিকা সত্ত্বেও ইহার অভ্যুদয়। ···

ইংরেজী ভাষা শিক্ষার আগ্রহ ও মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা তখনও শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল ছিল। এর কারণ প্রধানত আর্থিক। তথাপি উনবিংশ শতাব্দী থেকেই বাঙলা ভাষায় মহৎ সাহিত্য সৃষ্ট হয়। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অনন্যসাধারণ প্রতিভাই তার উৎস। যাহোক, আলোচ্য পত্রিকাখানি তার মহৎ সঙ্কল্প পালনে কতখানি সফল হয় তা জানা যায় না। আর, বিদ্যালয়ের কি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পত্রিকাখানির তদারক করতো তাও অনুমানসাপেক্ষ। যদিও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করবার, তাঁদের রচনা প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে তথাপি রচনা ও রচনার বিষয় পরীক্ষা করে একথা বলা যায় যে, পত্রিকাখানি বালক-বালিকাদের উপযোগী ছিল না বা হয়ে ওঠে নি। বালক-বালিকাপাঠ্য পত্রিকাতেই 'ধাঁধা' থাকে। প্রকৃতিরও প্রতি সংখ্যাতে এই বিভাগটি থাকতো। নিয়মাবলী পাঠেও জানা যায়, পত্রিকাখানি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের জন্যই প্রকাশিত হোত। কিন্তু রচনা ও বিষয়বস্তু বিপরীত প্রমাণ দেয়।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারকে শিশু-সাহিত্যে সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়। তাঁর যে গ্রন্থখানি তাঁকে যশস্বী করেছে—'ঠাকুরমার ঝুলি'র কথা বলছি—তখনও প্রকাশিত হয় নি। তিনি প্রকৃতির প্রথম বর্ষের একটি সংখ্যায় বালক-বালিকাদের জন্য যে কবিতাটি রচনা করেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :

আধুনিক মুর্শিদাবাদ চিত্র।

হের সখে, ওই দূরে স্তব্ধ সুনীরব
সুবিস্তৃত স্তূপাকৃতি অতি জীর্ণ শীর্ণ
অতীতের সুবিশাল কীর্ত্তির ললাম
দাঁড়াইয়া ক্ষুব্ধাকুল। বিষমবিদীর্ণ
বিশাল হৃদয় হতে অতীত ক্ষোভের
উঠি ভীম মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হাহাকার
মিশিছে অনন্ত শূন্যে! অতীত বৈভব,
মহান গৌরব চূর্ণ,—ব্যথা সার! ...

দক্ষিণারঞ্জনের দুটি প্রবন্ধ ও একটি গল্পও পত্রিকাখানিতে প্রকাশিত হয়। তবে সেগুলিতে 'ঠাকুরমার ঝুলি' রচয়িতার ছাপ চোখে পড়ে না।

প্রথম বর্ষেই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় বালক-বালিকাদের জন্য খগেন্দ্রচন্দ্র দেব লিখিত 'ভ্রমর' নামক উপন্যাসের কিয়দংশ পাঠে জানা যায় পত্রিকাখানি কাদের জন্য প্রকাশিত হোত এবং পাঠক-পাঠিকা ছিল কারা।

তবে প্রকাশকের কথায় এ সংবাদও পাওয়া যায়, মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণও পত্রিকাখানির পাঠক ও লেখক ছিলেন। বয়স্ক-গণপাঠ্য পত্রিকায় যে তরুণেরা রচনা প্রকাশের সুযোগ পেতেন না, তাঁদের জন্যও ছিল এই পত্রিকা। সেজন্যই পত্রিকাতে মিশ্র রচনার জোট দেখা যায় বলে মনে হয়।

> ভ্রমরের কিয়দংশ · কন্যা দেখিয়া রামবাবু ও তদীয় বন্ধুগণ প্রীত হইলেন। এবং সেই স্থানেই পুত্রের বিবাহ দিবেন, এইরূপ আশা দিয়া যাইলেন। কিয়ৎ দিবসের মধ্যে ঘটক মহাশয় একখানি ফর্দ্দ লইয়া নরেন্দ্র বাবুকে দিলেন। ফর্দ্দখানি পাঠ করিয়াই তাঁহার সমস্ত আশাভরসা দূর হইল। ইহার কারণ এই যে, ফর্দ্দখানি আধুনিক প্রথানুসারে লিখিত। পাঠকবর্গ! বুঝিতে পারিয়াছেন কি? যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে একবার ফর্দ্দখানি পাঠ করিয়া দেখুন।—স্বর্ণ ১০০ ভরি, রৌপ্য ৩০০ এবং নগদ ৪০০০৲টাকা! এতদ্ভিন্ন রদারাম মেকারের ঘড়ি, ঘড়ির চেন, খাট, বিছানা, তৈজস প্রভৃতি। কেহ যেন আশ্চর্য্য হইবেন না; আজিকালি পাঁঠাবিক্রেতাদের চাপরাস-যুক্ত পাঁঠার দর এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। কতদূর যে স্থির হইবে তাহা ভবিষ্যতের তমসাচ্ছন্ন গর্ভে নিহিত।···

প্রকৃতিতে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও কুমুদরঞ্জন মল্লিকেরও কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে সকল রচনা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের যোগ্য ছিল না। রচনাগুলি সম্ভবত তাঁরা তাঁদের জন্য লেখেননি।



রামমোহন রায় ॥ পৃষ্ঠা ৩৭ ॥

শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকার মধ্যে প্রথম প্রকৃতিতেই কয়েকজন মুসলমান লেখকের রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন কবি মোজাম্মেল হক ও আবতুল করিম। করিম সাহেবের প্রবন্ধ কয়টি ছিল গবেষণামূলক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের পত্রিকাগুলি অপেক্ষা প্রকৃতি বিষয়ের দিক থেকে বৈচিত্র্য প্রদর্শন করতে পারে না। সেগুলিরই প্রদর্শিত পথে প্রকৃতিতে কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও ধাঁধা প্রকাশিত হোত। তবে পত্রিকাখানি কথোপকথনের মাধ্যমে একটি ধারাবাহিক নীতি-আলোচনার মধ্যে মধ্যে ভাবসমৃদ্ধ প্রচুর ইংরেজী উদ্ধৃতিতে সকলকে অতিক্রম করে। মনে হয়, সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকাগণকে লেখক 'এথিকস্' শিক্ষা দিতে উৎসাহী হন। আর, সমগ্র পত্রিকার রচনা বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রকাশক মহাশয়ের পত্রিকা প্রকাশের সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। তথাপি পত্রিকাখানি চার বৎসর জীবিত থাকে। পত্রিকাখানি প্রকাশিত হোত কলকাতায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বালক-বালিকাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত উপরোক্ত পঁচিশখানি পত্রিকার কথাই এ পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি।

এইগুলিকে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বাংলার বালক-বালিকাদের জন্য সাহিত্য রচনারও সূত্রপাত হয় শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের প্রচেষ্টায়। তবে এই মহৎ কর্মে তাঁরা আমাদের দেশের জনকয়েক মনীষীর সহযোগিতা লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ও ছিলেন। 'দিগ্দর্শন' যে একখানি সাময়িক পত্রিকা ছিল তার নামপৃষ্ঠা দেখে তাতে আর সন্দেহ করা চলে না। এই পত্রিকায় অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেগুলির অধিকাংশই রাজা রামমোহন রায়ের রচনা বলে কারও কারও ধারণা। এই সকল নিবন্ধ পরে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে খৃস্টান স্কুল বুক সোসাইটি 'বঙ্গ বিদ্যালয়ের' ছাত্রগণের জন্যে 'বঙ্গীয় পাঠাবলী' নামে গ্রন্থে

প্রকাশ করেন। 'বঙ্গীয় পাঠাবলী'তে 'অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি', 'মকর মৎস্যের বিবরণ,' 'বেলুন', 'প্রতিধ্বনি' প্রভৃতি নিবন্ধ ছিল। এগুলি দিগ্দর্শনের পরবর্তী সময়ে রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে পত্রিকায় কিছু পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয়। অতএব দেখা যায়, রাজা রামমোহনও আমাদের বাংলার বালক-বালিকাগণের জন্য সাহিত্য রচনা করেছিলেন এবং তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দানও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। [কেদারনাথ মজুমদারকৃত বঙ্গাব্দ ১৩২৪ সালে প্রকাশিত 'বাংলার সাময়িক পত্র সাহিত্য' দ্রষ্টব্য]। 'দিগ্দর্শনে'র ভাষাকে কেউ কেউ বালক-বালিকাগণের অনুপযোগী বলতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তখন বাঙলা গদ্যেরও শৈশব। এখনকার মতো তা সুগঠিত সমৃদ্ধ সাবলীল হয়ে ওঠে নি। আর এই গদ্য রচনা ছিল ইংরেজীর অনুবাদ। ভাষার শব্দভাণ্ডার সুসমৃদ্ধ না হোলে রচনা কি মৌলিক কি অনুবাদ সাবলীল হোতে পারে না।

কোনও দেশের শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে শিশু-সাহিত্যও রচিত হোতে থাকে। আমাদের বাংলায় ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই ১৮১৭ খৃস্টাব্দে, ৪ঠা জুলাই কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। আর, তারপর থেকেই বাংলার বালক-বালিকাগণের জন্য নানা গ্রন্থ রচিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তবে এ কথা সত্য যে, সে সকল গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। কিন্তু যাঁরা বলেন, বাংলার তখনকার শিশু-সাহিত্য কেবল পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁদের ১৮১৮ খৃস্টাব্দেব 'দিগ্দর্শন', ১৮২২ খৃস্টাব্দের 'পশ্বাবলী' ও তৎপরবর্তীকালের সাময়িক পত্রগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াব দিক থেকেই পাঠ্যপুস্তকের নিগড়ের বাইরেও বাংলার শিশু-সাহিত্য রচিত ও পুষ্ট হোতে থাকে। কাজেই দেখা যায়, বাংলার বর্তমান শিশু-সাহিত্যের বয়ঃক্রম প্রায় দেড় শতাব্দী। উইলিয়াম কের রচিত ও ১৮১২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ 'ইতিহাস-মালা'কে বাংলার শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করলে, যা কেউ কেউ করে থাকেন, এই

সাহিত্যের বয়স আরও বৎসর কয়েক বেশি হয়। কিন্তু গ্রন্থ ধরে কোনও দেশের সাহিত্যের বয়স নির্ণয় যুক্তিসঙ্গত নয়। এক সময়ে সাহিত্য মুখে মুখেও সৃষ্ট ও প্রচারিত হয়েছে। বাংলার রূপকথা ও ছেলে-ভুলানো, ঘুম-পাড়ানো ছড়াগুলি এই শ্রেণীর। এগুলির কিছু কিছু মুদ্রণ হয় উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে— তার পূর্বের খবর আমাদের জানা নেই— অথচ এগুলি বয়সে অতি প্রাচীন।

রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে ;

না জানি কোন নদীর ধারে।
না জানি কোন দেশে
কোন ছেলেরে ঘুম পাড়াতে
কে গাহিল গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান।

কিন্তু,

ছেলে ঘুমুলো
পাড়া জুড়ুলো
বগী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে—

এই আকুলতা ভরা ছড়াটির বয়স আন্দাজ করা সম্ভব। স্পষ্টতই বোঝা যায়, এটির উদ্ভব পল্লী বাংলায় বর্গী-হাঙ্গামার ফলে। বর্গীর হাঙ্গামা হয় বাংলার নবাব আলীবর্দীর সময়ে ১৭৪০ খৃস্টাব্দের পর। তবে সকল ছড়া শিশুদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এবং সকল রূপকথা তাদের আনন্দ দানের জন্য রচিত এমন কথা উভয় সাহিত্য বিচার করে বলা যায় না। এগুলি বাংলার লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত।

অনেকের একটা ধারণা আছে, বাংলার শিশু-সাহিত্য শিশুদের মতোই নিতান্ত স্বল্পবয়স্ক এবং এই সাহিত্য বিংশ শতাব্দীতে কোনও একজনের একক প্রচেষ্টায় বা কোনও একটি পরিবারের মিলিত যত্নে, শ্রমে ও প্রতিভায় সৃষ্ট হয়ে সেখানেই শেষ হয়েছে। সেখানেও

বাইরের বহুর যোগ ছিল। কিন্তু বাংলার শিক্ষা ও শিশু-সাহিত্যক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলী অন্যরূপই প্রমাণ দেয়। এই বিংশ শতাব্দীতেও আমরা বাংলার শিশু-সাহিত্যের যে সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল রূপ দেখি তাও গঠন করেছেন একজনে নয়,—নানা জনে। বাংলার শিশু-সাহিত্য বাংলার বিরাট জাতীয় সাহিত্যেরই একটি অংশ। সে সাহিত্যের যেমন প্রাণ ও গতি আছে, এতেও তেমনি তা পরিপূর্ণ-ভাবেই বর্তমান।

কিন্তু নিছক আনন্দদানই তখনকার সাহিত্য রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য ছিল না একথা আমরা একাধিক পত্রিকার সম্পাদক বা প্রকাশকের কথায়ও জানতে পারি। পত্রিকাগুলির প্রায় সকল রচনা ছিল শিক্ষামূলক এবং সেগুলি যাতে সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকাগণের চিত্তগ্রাহী হয় সেই উদ্দেশ্যে সরস করা হোত। বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ও নীতিকথা ছিল প্রায় সকল পত্রিকার বিষয়বস্তু। কিন্তু সকলগুলিই গল্পের ছাঁচে রচিত। আর, নীতিকথা তো ছিল নীতিগল্প। সকল পত্রিকারই উদ্দেশ্য ছিল পাঠক-পাঠিকার নৈতিক চরিত্রগঠন ও শিক্ষাপ্রদান। তখনকার শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলিতেও তার প্রমাণ সুস্পষ্ট। এ সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র 'গ্রন্থ-প্রসঙ্গে' আলোচনা করেছি।

এই সকল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা অনেকক্ষেত্রেই ছিলেন একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ, বাইবেল ট্রাক্ট সোসাইটি ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পত্রিকাগুলি কিন্তু তাঁদের ধর্মীয় মতের বাহন ছিল না। দেশে যে নূতন শিক্ষার, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হচ্ছিল সেগুলিতে ছিল তারই প্রতিফলন। তবে দু'-একখানি পত্রিকা সে পথ গ্রহণ করে নি, যেমন বারাণসীর ধর্মামৃত যন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত 'সুনীতি' ও পাদ্রি জে. ই. পেন সম্পাদিত 'বাল্যবন্ধু'। এই দুটি মাসিক পত্রিকা ছিল কর্তৃপক্ষের স্ব স্ব মত প্রচারের বাহন। কিন্তু ঈশ্বরে বা দেব-দেবীতে বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্যে অসম্ভব অতিপ্রকৃত কাহিনীর আশ্রয় কেউই গ্রহণ করেন নি। বুদ্ধি ও সাহস সঞ্চারের অজুহাতে কোনও

পত্রিকায় 'থ্রীলার' প্রকাশিত হোত না। মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকার প্রমাণস্বরূপ পরলোকবাসীদের কার্যকলাপ কাহিনীও কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হোত না। বরং ভৌতিক ব্যাপার যে অলীক তা বোঝাবার চেষ্টা দেখা যায়। কবি বিহারীলাল ও ত্রৈলোক্যনাথ সে চেষ্টা করেন। অথচ সে যুগে আজকালকার মতো শিক্ষার প্রসার ছিল না!

বাংলা দেশের ছাপাখানা ও গদ্য সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল সাময়িক পত্রিকাও মুদ্রণে ও রচনায় উন্নত হয়। চিত্রগুলি উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে এবং মধ্যভাগেও ইংরেজ চিত্রকরগণ কর্তৃক অঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু নব্বই সালের পর দু'-একখানি চিত্রকোণে 'প্রিয়নাথ কর্মকারে'ব নামাঙ্কিত দেখা যায়। এই শতাব্দীর শেষ ভাগেই বাংলার কৃষ্টিতে যাঁদের দান অমূল্য তাঁদের মধ্যে অনেকে যিনি যে বিষয়ের চর্চা করতেন, সেই বিষয়ের রচনায় এই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম থেকেই বিজ্ঞান ছিল পত্রিকার অন্যতম প্রধান বিভাগ। সেই সঙ্গে থাকতো দেশের ইতিহাস ও ভৌগোলিক পরিচয়। ভারত-সীমার ওপারেও যে বৃহত্তর পৃথিবী আছে সে সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে থাকতো বিদেশের সংবাদ, কাহিনী ও প্রবন্ধ। কিন্তু সবই ছিল শিক্ষামূলক—Art for art's sake-এর পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। আবার, কোনও মতবাদ মন্দ ও অকল্যাণকর বা কোনও মতবাদ উৎকৃষ্ট ও মঙ্গলেব তা বোঝাবার প্রচেষ্টাও আমরা দেখি না। বরং সুস্থ মানবতা বোধ, মানুষের প্রতি মমত্ব, মানুষকে যথোচিত মর্যাদা দানের এবং এই বিশাল পৃথিবীর বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদরাজ্যের যে আমরা একটি অংশ এই বোধ জাগাবারই ছিল সাধু প্রচেষ্টা। পাঠকের কল্পনা ও প্রজ্ঞাকে জাগ্রত করা পত্রিকাগুলির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তবে সকল পত্রিকাই যে বিষয়বস্তু ও রচনায় শিশু ও কিশোর মনের উপযোগী হয়েছিল প্রমাণ-দৃষ্টে তা বলা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'সখা ও সাথী', 'বালক' ও 'মুকুলে' বাংলার শিশু-সাহিত্যের কতকগুলি স্থায়ী সম্পদ প্রকাশিত হয়।

আমাদের কালে, এই বিংশ শতাব্দীতেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। বহু উপন্যাস, গল্প, নাটক ও কবিতা প্রথমে সাময়িক পত্রেই প্রকাশিত হয়ে বাংলার শিশু-সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। ভাবীকালেও এর ব্যতিক্রম ঘটবে না।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পত্রিকাগুলির অধিকাংশেরই আয়ু ছিল তিন বৎসরের মধ্যে। যে কয়খানি তারও বেশিকাল জীবিত ছিল, সেগুলি মাসিক পত্রিকা—পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক নয়। কারণ বালক-বালিকাপাঠ্য পত্রিকা ও সাহিত্যের আয়ু সম্পূর্ণ তাদের রুচির উপর নির্ভরশীল নয়। তাদের আর্থিক সামর্থ শূন্য। এগুলি অভিভাবক-গণের রুচি, বিচার, শিক্ষা, সামাজিক পরিবেশ ও আর্থিক সঙ্গতিরই মুখাপেক্ষী। আজকাল পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভের একটা সুযোগ ঘটেছে। তবে সকলের সে সৌভাগ্য হয় না। কারণ, এর মূলে প্রধানত রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ—যেমনটি সেকালে ছিল না।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, যেমন একালে, তেমন সেকালেও বালক-বালিকাদের পাঠ্য সাময়িক পত্রিকাগুলি সম্পূর্ণত ৮।৯ বৎসরের শিশুদের উপযোগী ছিল না। বিষয়বস্তু, রচনা ও ভাষায় সেগুলি ছিল কিশোর-বয়স্কগণের উপযোগী। তবুও সেগুলি ছিল শিশু-সাহিত্যের অন্তর্গত।

একালের পত্রিকাগুলি ও সেকালের পত্রিকাগুলি তুলনা করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উনবিংশ শতকের মহৎ প্রচেষ্টাই সাময়িক পত্রিকা-জগতে বিংশ শতাব্দীকে পথের নির্দেশ, জ্ঞান ও শিক্ষা দিয়েছে। তার ওপর ভিত্তি করেই একালের সুন্দর পত্রিকাগুলি প্রস্তুত হয়। অবিশ্যি ধাতুপত্রে ব্লক নির্মাণে, মুদ্রণ ব্যাপারে, রকমারি কাগজ প্রস্তুত করণে বিংশ শতক গত শতকের চেয়ে অনেক অগ্রসর। আবার, একালে বহু চিত্রশিল্পীর উদয় হয়েছে। এ সকলের সাহায্যে ও বিদেশের উদাহরণ-দৃষ্টে পত্রিকাগুলি সেকালের চেয়ে অনেক সুদৃশ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে বটে। তবে সেকালে কিশোরদের জন্য 'দৈনিক' প্রকাশের চেষ্টা কেউ করে নি। পৃথিবীর কোনও দেশে তখনই

তার দৃষ্টান্ত ছিল না। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমার্ধের প্রায় শেষ ভাগে রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে একটি প্রগতিশীল বৈদেশিক রাষ্ট্রে তার আবির্ভাব হয়। আমাদের বাংলাতে সামাজিক ব্যাপারে সেরূপ কিছু না ঘটলেও চিন্তাধারায় কিছুটা বৈপ্লবিক ভাবের ফলে সাময়িক পত্রিকা-জগতে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণের চেষ্টা হয়েছিল ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে 'কিশোর' নামক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশে। কিন্তু প্রতিকূলতার দরুন পত্রিকাখানি স্থায়ী হতে পারে না।

ইউরোপের সংস্পর্শে উনবিংশ শতকে বাংলার জাতীয় জীবনে নবজাগরণ আসে, বাংলার সংস্কৃতিতে নূতনের আবির্ভাব হয়। তারই অন্যতম স্বাভাবিক ফল শিশু ও কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্কপাঠ্য নানা ধরনের পত্রিকার প্রকাশ। এই যুগটিকে যথার্থই বলা হয় বাংলার স্বর্ণযুগ। এই যুগের স্বর্ণালোকেই বাংলার শিশু-সাহিত্যেরও একটি শাখা পুষ্পিত ও অপর শাখাগুলি মুকুলিত হয়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দী

॥ ১৯০৭ খৃঃ অঃ—১৯১৮ খৃঃ অঃ ।।

২৬ ॥ এই প্রকৃতিব অন্তর্ধানের পর মনে হয় ছয় বৎসরের মধ্যে আর কোনও শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয় না। অতঃপর ১৯০৭ খৃস্টাব্দে (১৩১৪ বঃ অঃ, কার্তিক) 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ'ও 'প্রকৃতি' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাখানির রচনাবলী মোটের ওপর উৎকৃষ্ট না হোলেও বালক-বালিকাদের উপযোগী ছিল এবং কয়েকটি নূতন বিভাগ ছিল যা বিংশ শতাব্দীর আলোচ্য পত্রিকাগুলিতে দেখা যায় না। পত্রিকাখানির লেখকবৃন্দের মধ্যে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় ও মাইকেল-চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসুও ছিলেন। বালক-বালিকাদের কাছে বস্তুর পরিচয় দানোদ্দেশ্যে যোগেশচন্দ্র 'চীনী', 'ডাইল-ভাত' 'ঝড়-বাদল' 'ভূমিকম্প' ও 'বেলীফুল' নামে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক রচনা লেখেন। সকল বয়সের পাঠক-পাঠিকার কাছেই বৈজ্ঞানিক গল্পের আদর। কিন্তু সত্যকারের বৈজ্ঞানিক গল্প রচিত হয় অল্পই। রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গী পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক না হোলে, তাঁর পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকলে গল্পটির মধ্যে যথেষ্ট অলীকতা থাকে। তা সরস গল্প হোতে পারে, কিন্তু তাকে বৈজ্ঞানিক গল্প বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকতার মধ্যে কল্পনা-বিলাসিতা নেই।

পত্রিকাখানি প্রকাশিত হবার এক বৎসর পরে, কার্তিক সংখ্যায় আচার্য মহোদয়ের 'চীনী' নামক বৈজ্ঞানিক গল্পটি প্রকাশিত হয়।

চীনী

বিমল ও নিমল দুই ভাই। বিমল বড়, নিমল ছোট।

একদিন দুই ভাইয়ের মধ্যে তর্ক উঠিয়াছিল। বিমল বলে, কয়লা ও জল মিলিয়া চীনী। নিমল চীনী খাইতে ভালবাসে। চীনীতে কয়লা শুনিয়া নিমলের রাগ হইল।

কার না রাগ হয়? চীনী কেমন শাদা ধবধবা; কেমন মিঠা! বিমল বলে, চীনীতে অঙ্গার!

বিমলও খাবার সময় অল্প চীনীতে তুষ্ট হয় না। মুঠা মুঠা চীনী নইলে দুই ভাইএর মনে ধরে না।

সন্ধ্যার পর হইতে দুই জনের তর্ক চলিতেছিল। রাত্রে খাবার সময় হইল। মা রুটী ব্যন্নন, এবং বিমল ও নিমলের থালায় এক এক থাবা চীনী দিয়া দুই ভাইকে খাইতে ডাকিলেন। কেহ ওঠে না। এদিকে খাবার জুড়াইয়া যায়। মা শুনিলেন, চীনীতে কয়লা আছে কিনা, এই কথা লইয়া দুই ভাইএর ঝগড়া।

মা বলিলেন, খাবার সময় রাগ করা, ঝগড়া করা, তর্ক করা ভাল নয়। যেমন তেমন করিয়া তাড়াতাড়ি ভাত ডাইল রুটী গিলিয়া ফেলিলেই খাওয়া হয় না। শুদ্ধ মনে খাইতে বসিবে, মন দিয়া খাইবে; নতুবা খাওয়াতে মন তুষ্ট হয় না। যদি চীনীতে কয়লা আছে, কালি বিমল তাহা দেখাইবে। যে কথা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মিটিয়া যায়, সে কথা লইয়া তর্ক কেন? দেখ দেখি, আজি কতখানি চীনী দিয়াছি।

মায়ের বিচারে নিমল যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কেবল চীনী ত নয়; চীনী দিয়া সন্দেশ, রসগোল্লা হয়। চীনীতে অঙ্গার বলিয়া চীনী ছাড়িতে হইলে সন্দেশ, রসগোল্লা ছাড়িতে হয়। তা পারা যায় কি?

বিমল ইস্কুলে দেখিয়া আসিয়াছিল, শিক্ষকমহাশয় চীনী হইতে কয়লা ও জল বাহির করিয়াছিলেন। কি উপায়ে

পরীক্ষাটি করিবে তাহা ভাবিতে ভাবিতে বিমল খাইতে বসিল। বলা বাহুল্য, বিমল ও নিমলের কেহই থালে একটুও চীনী ফেলিয়া রাখিল না।

পরদিন সকাল হইতে না হইতে নিমল দাদাকে ধরিয়া বসিল। সেদিন রবিবার। ইস্কুল যাইবার তাড়াতাড়ি নাই। রাত্রে বিমল বুদ্‌ধি স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। সে একটা পিতল বাটীতে চীনী রাখিয়া গন-গনা আঙগারার উপর বাটীটি চাপাইয়া দিল। পিতলবাটীর মুখে একটা পাথর বাটী চাপা দিল। নিমল এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল।

সবাই জানে আগুনে চীনী গলিয়া যায়, পরে লাল হয়, পরে কয়লার মত কাল হয়, শেষে কয়লাই হয়। উপবের পাথরের বাটীতে জল জমিয়া যায়।

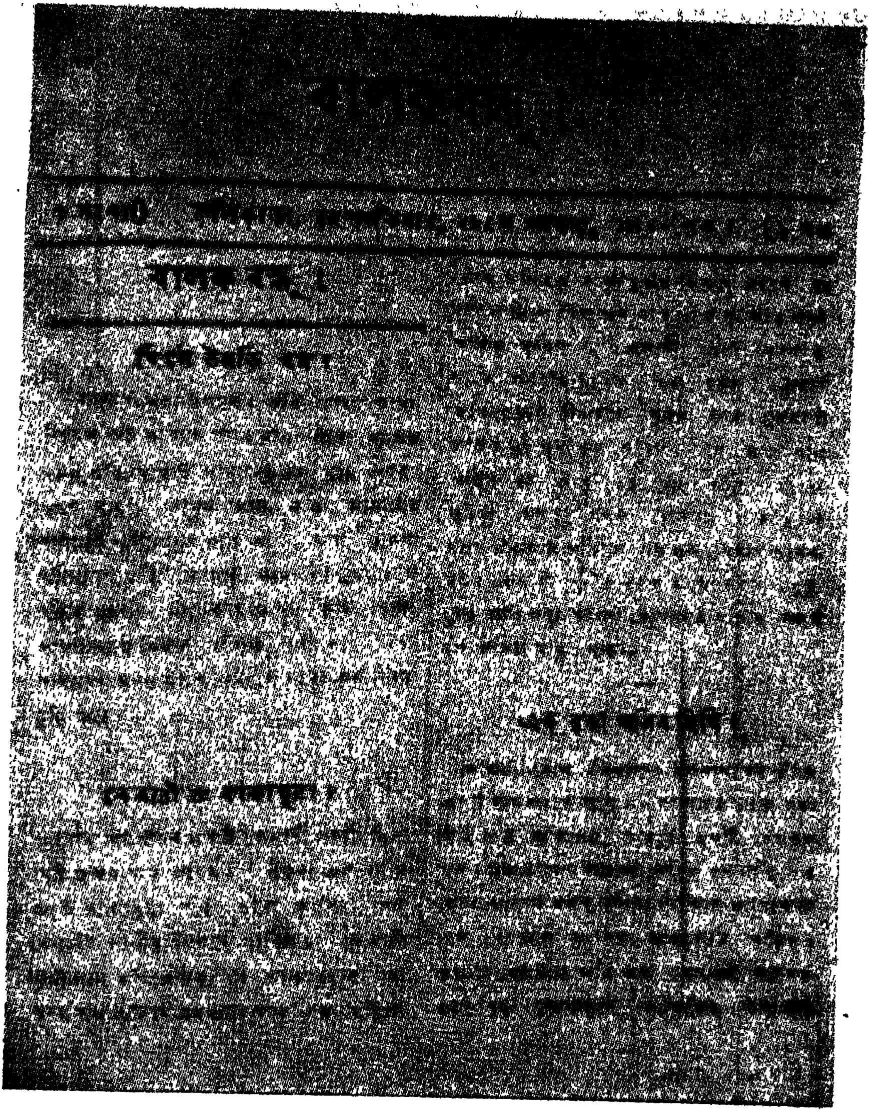
যখন ধুঁআ বন্‌ধ হইল, তখন বিমল বাটী নামাইয়া নিমলকে দেখাইল। নিমলের মুখ দিয়া কথা সরিল না। নিশ্চয় তাহাব হারি। তবু সে বলে, বাটীতে কয়লা নয়।

কি তবে? বিমল বাটীর একটু কয়লা আগুনে ফেলিল। সেটা পুড়িয়া গেল। জলে একটু ফেলিল। সেটা জলে মিশিল না। তবে সত্য সত্যই কয়লা!

চোখের সামনার ঘটনা মিছা বলিবার যো নাই। নিমল ভাবিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! কয়লা ও জল মিলিয়া চীনী?"

রচনাটি বৈজ্ঞানিক গল্প। এই থেকে দেখা যায়, আচার্য যোগেশচন্দ্র বাংলার বালক-বালিকাদের জন্য গল্পও রচনা করেছিলেন। চিনি যে কয়লা ও জলের মিলনে তৈরী তা অনেক বয়স্কেরও জানা নেই।

প্রকৃতির নূতন বিভাগ দুটির মধ্যে একটি 'আমাদের দেশের কথা', অপরটি 'স্বাস্থ্য-রক্ষা'। আমাদের দেশের কথায় বাংলা দেশ ও ভারতের ভৌগোলিক পরিচয় দেওয়া হোত, আর স্বাস্থ্য-রক্ষায়



'বালকবন্ধু' পত্রিকার প্রতিলিপি